রক্তের অক্ষরে

শৈলেশ দে

॥ বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস ॥
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ কলেজ্ রো, কলিকাতা-৯

দাম নয় টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার দত্ত
রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

অগ্নিযুগের 'মহারাজ' স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

— শৈলেশ দে —

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ—

আমি সুভাষ বলছি ঃ প্রথম খণ্ড ঃ (পঞ্চম সংস্করণ)

আমি সুভাষ বলছি ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বিনয়-বাদল-দীনেশ ঃ (চতুর্থ সংস্করণ)

ক্ষমা নেই (তৃতীয় সংস্করণ)

ফাঁসির মঞ্চ থেকে (দ্বিতীয় সংস্করণ)

রক্ত দিয়ে গড়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)

শপথ নিলাম

ও

অন্যান্য

শ্রীশৈলেশ দে-র "রক্তের অক্ষরে" নামক পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে আমি গ্রন্থকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বইখানার পাণ্ডুলিপি ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরিয়া পড়িলাম। ৮৬ বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ দেহে হাসপাতালের রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া যখন শেষদিনের অপেক্ষা করিতেছি, তখন সহসা এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া বিগত ইতিহাসকে প্রণাম না করিয়া পারিলাম না। সেই ইতিহাস যে এত সুন্দর ছিল তাহা বর্তমান যুগের শৈলেশবাবুদের চোখের চশমা পরিয়া যেন নূতন করিয়া দেখিলাম!

ইংরাজের পদভারে পিষ্ট পরাধীন ভারতে যাঁহারা অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বিদ্রোহের মশাল জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহারা ঘুমন্ত মানুষের চৈতন্তে বিপ্লবের বাণী সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার আগ্রহে শৈলেশ দে বিষয়বস্তুর অনুপাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিসীমায় একটি সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। ছবির মত আঁকিয়া তুলিয়াছেন সেই দিনের অগ্নিছোঁয়া রূপটিকে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন: "খাঁটি বিপ্লবী হতে গেলে চাই বিপ্লববাদের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। চাই গভীর দেশাত্মবোধ। চাই ইস্পাত-কঠিন অনমনীয় চরিত্র, যা হাজার আঘাতেও এতটুকু টলবে না।"—হাঁ, ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু ইহার সঙ্গে চাই নিখুঁত সামরিক-নিয়মানুবর্তিতাবোধ ও মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষা। গ্রন্থকার এবম্বিধ বিপ্লবী-চরিত্রের চমৎকার উদাহরণ অনবদ্য ভাষায় লিখিয়াছেন অনন্তহরি মিত্রের প্রাণদানের কাহিনী, কালীপদ মুখার্জির জীবনের বিনিময়ে হত্যার দায়িত্ব নিজের উপর টানিয়া লইবার কথা, মনীন্দ্র দত্তের—'I prefer death to surrender', পঞ্চানন চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্র সিংহের বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়াও ঠাট্টার সুরে সাহেব শাসককে বলা—'Have you got your salam ?' প্রভৃতি কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে। এই স্বল্প পরিসরেই ভারতবর্ষের বিপুল বিপ্লবী-চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, যেমন ক্ষুদ্র পুকুরের টলটলে জলে নক্ষত্রখচিত সীমাহীন আকাশের প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে।

পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া হাসপাতালের পরিবেশ ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল আমি যেন আমার অতীত দিনে ফিরিয়া গিয়াছি। মনে পড়িল আজ

হইতে দীর্ঘ ৬২ বৎসর পূর্বের কথা। হুবহু মনের তটে আসিয়া সকল কথা, সকল কাহিনী ভিড় করিতে লাগিল। ভূমিকায় সেই কথারই কিছুটা বলিয়া রাখিব। কারণ ইহার পর পুনরায় শুরু হইবে রোগাতুর দেহে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে।

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টায় ভ্রমবশত ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি কেনেডি সাহেবের পত্নী ও কন্যাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিলেন। কিন্তু অতবড় ব্যর্থতার মধ্যে যে কত বড় সার্থকতা পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা সংগ্রামী-ভারতবর্ষ জানিত, এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজও বুঝিয়াছিল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের জন্ম না হইলে নেতাজীর যে আবির্ভাব ঘটিত না—ইহা আজ ইতিহাসও স্বীকার করিতেছে।

ঘটনার পরদিনই পয়লা 'মে' তারিখে মোকামা ঘাটে পুলিশ সাব্-ইন্সপেক্টর ধূর্ত নন্দলাল ব্যানার্জির অতিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্ল চাকি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হইয়া নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটেই আত্মবিসর্জন করিলেন।

নন্দলাল আনন্দে ডগমগ। বিদেশী-শাসকদের কৃপায় তাহার 'উপরি অর্থ' প্রাপ্তি হইল, চাকুরিতে-ও প্রমোশন হইল।

কিন্তু বিপ্লবীদের শাসন-দণ্ডও তো অচল নয়। দুষ্কর্ম যে করিল, তাহাকে ন্যায্য শাস্তি বিপ্লবীরা তো দিবেনই। প্রফুল্লের আত্মবিলয়নের পর মাত্র ছ'মাস এবং দিনকয়েক বাঁচিয়াছিল ইংরাজের এই নন্দদুলাল।

আমার পরিচয় তখন ছিল বিপিনদাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামক গুপ্ত বিপ্লবীদলের একজন অখ্যাত অথচ বিশ্বস্ত কর্মী রূপে। আমাকে একদিন আমাদের অপর দাদা হরিশ সিকদার মহাশয় আদেশ দিলেন নন্দলালকে নানা ভাবে অনুসরণ করিয়া তাহার সর্ববিধ পাত্তা সংগ্রহ করিতে। সকল সংবাদ গ্রহণ করার পর ক্রমে কার্য্যের দিন, তারিখ, সময় এবং স্থান ঠিক হইল। এইবার কাজের পালা। আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীশচন্দ্র পালের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হইয়া নন্দলাল-নিধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা 'রক্তের অক্ষরে' গ্রন্থে নির্ভুল ভাবে লিখিত হইয়াছে। 'মহাজাতি সদন' কর্তৃক গৃহীত আমার ভাষণের টেপ-রেকর্ড্ হইতে যে অংশ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে তাহাতেই আমার স্মৃতিচারণ অক্ষত রহিয়াছে।

বস্তুতই নন্দলাল-হত্যার ঘটনাটি এতই গোপনে ঘটিয়াছিল এবং শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তিসংঘ' এবং আমাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি'র পারস্পারিক Political understanding তৎকালে এতই চমৎকার ছিল যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ চলিয়া যাইবার দিন পর্যন্ত তাহারা জানিতে পারে নাই যে উহা কাহাদের বা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের কাজ। এই গোপনীয়তা হেমবাবুর দল শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ১৯৩০ সাল হইতে প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ-শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। সেই বহ্নিদীপ্ত যুগেরও কিছুটা আভাস শৈলেশবাবুর এই গ্রন্থে চমৎকার ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। সূর্য সেনের অনন্ত-সাধারণ নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যে-বিপ্লব সূচিত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে-ও ছিল নিয়মানুগ এই মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে নিখুঁত প্রস্তুতি।

শৈলেশ দে 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক। তাঁহার মানসিকতা বর্তমান যুগকে ছুঁইয়া আছে। কাজেই তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে বিগত যুগের শৌর্যময় ইতিহাস যদি বর্তমান কালের যুবক-যুবতীদের কাছে হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠে তবে আনন্দিত হইব।

আমি কামনা করি "রক্তের অক্ষরে" সর্বজন সমাদৃত হউক।

রিষড়া সেবা সদন,
রিষড়া

শ্রী রণেন্দ্র নাথ সরকার

সেদিন মেদিনীপুরের জেলা-শাসক মিঃ ডগ্‌লাসকে মৃত্যুদণ্ড দানের আদেশ এসেছিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও আমার উপর। 'বি-ভি'-র বিপ্লবী-সদস্যদের ঘরের মানুষ, তাঁদের প্রিয়তম পথপ্রদর্শক হলেন বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত। বাঙলার বিপ্লবীদের চোখের সম্মুখে সেদিন ঝুলছে চট্টগ্রামের বিজয় অভিযান, সূর্য সেনের অমর কীর্তিধ্বজা, কানাই ভট্টাচার্যের আগুন-ছোঁয়া ছবি। অধিকন্তু আমরা—মেদিনীপুরের বিপ্লবী-বন্ধুরা—ছিলাম শহীদ দীনেশদারই (গুপ্ত) হাতে-গড়া সৈনিক। তাঁর গরবে গরবী আমরা প্রত্যেকটি সতীর্থ। তাই রাইটার্স্‌-প্রাসাদে অলিন্দ-যুদ্ধের পর দুঃসহ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আমাদের সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতা থেকে পার্টি-নেতাদের দেওয়া ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আমরা প্রত্যেকেই কাল গুণছিলাম। কাজেই সে ছাড়পত্র যাঁর উদ্দেশ্যে আসতো, তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না। তিনি ভাগ্যবান। আমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাস-গুপ্ত সেই ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। মেদিনীপুরের প্রথম জেলা-শাসক মিঃ পেডি তাঁদেরই হস্তে প্রাণদণ্ড লাভ করলেন। যতিজীবন ও বিমল দাসগুপ্ত তাই এ-শহরে ছিলেন আমাদের পথিকৃৎ। তাঁরা ভাগ্যবান। সেই ভাগ্যলোভী আমরাও সেজন্য দেশজননীর অঙ্গে পরানো নিষ্ঠুর শৃঙ্খলে কঠিন আঘাত হানবার কল্পনায় যাত্রা করেছিলাম। যাত্রা করেছিলাম ডগ্‌লাস্‌-নিধনে। সে-যাত্রা আমাদের কাছে সেদিন রমণীয় হয়ে উঠেছিল ......

কাজ সম্পূর্ণ হল। প্রদ্যোৎ ধরা পড়লেন। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন বীরের মত। মৃত্যুকে স্পর্শ করে 'শহীদ' হলেন ক্ষুদিরামের মাটিতে। আজ গর্বে ও নিবিড় মমত্বে আমার প্রিয়তম বন্ধুকে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই দীনেশদা, বিনয়দা প্রমুখ ভারতবর্ষের তাবৎ শহীদকুলকে।

প্রীতিভাজন শ্রীযুত শৈলেশ দে তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে মেদিনীপুরের ১৯৩০-'৩৪ সালের বৈপ্লবিক-কাহিনীও পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনা-কৌশলে ও নিপুণ ভাষাবিন্যাসে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে, তিনি অতি নিষ্ঠায় যথার্থ তথ্যাদি ও ছবি সংগ্রহ

করে একে একটি প্রামাণিক গ্রন্থে পরিণত করেছেন। কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওভার্ট-এ্যাক্টে (Overt act) অংশগ্রহণকারী আমার সতীর্থের রচনা তিনি পুস্তকের উপসংহারে সংযুক্ত করেছেন। এতে তাঁর রচনাও একান্ত ইতিহাস-নির্ভর হয়েছে। শৈলেশবাবুকে আমি অভিনন্দিত করি। আমি জানি তাঁর "রক্তের অক্ষরে" বাঙলার তরুণ-তরুণীদের চিত্ত হরণ করবে। ঐতিহাসিকগণ প গ্রন্থখানি পড়ে উপকৃত হবেন। ॥ জয় হিন্দ ॥

১-বি গোপাল নিয়োগী লেন,
কলিকাতা-৩

প্রভাংশুশেখর পাল

দেশ, জাতি ও ধর্ম লইয়া মানব গোষ্ঠির একটি সত্তা আছে। আবার সর্বমানবের সমষ্টিগত আর একটি সত্তাও বর্তমান। ইহারা পরিপূরক। কিন্তু ইহারাই বিরোধী হইলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এই কারণেই। বিপ্লব আরও ব্যাপক। বিপ্লবে সভ্যতার রূপান্তর হয়। বাংলার বিদ্রোহের অন্তরালে বিপ্লব সঞ্চারিত ছিল।

স্নেহাস্পদ বন্ধু শৈলেশ দে বাংলার সেই পুরাতন দিনের বিপ্লব তপস্যার চিত্র উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। এ এক অসাধ্য সাধন। তবু এ লেখায় যুব বাংলার আকর্ষণ দেখিয়া আনন্দ হয়। আশা হয়, হয়তো বাঙ্গালী সত্যই আত্মসচেতন হইতে চাহিতেছে। এ লেখা সে চেষ্টার সহায়ক হোক, লেখার বহুল প্রচার হোক, এই কামনা করি।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

'চক্রতীর্থ'
১৭ ডি/১ এ রাণী ব্রাঞ্চ রোড
পাইকপাড়া, কলি-২

The goals for which the martyrs of Midnapur or for matter of that of the rest of India sacrificed themselves will have remained unfulfilled till a single man, woman or child in our country is unfed or inadequately fed, unclad or inappropriately clad, unhoused or poorly housed, till every child has basic equal opportunities in life, every man an honourable and decent means of living, and until there is total cessation of exploitation of man by man in any form".

I wish wide circulation of "রক্তের অক্ষরে" which may help our younger generation to conceive bravery and discipline, to be humane and selfless in action and thought. Let the memory of our Martyrs be the perinnial source of inspiration for them.

F A. O.,
U. N.,
ROME.

Parimal Roy

শহীদ-তীর্থ মেদিনীপুরকে খুব কাছে থেকে দেখার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। সে ইচ্ছা ফলবতী হয়েছিল গত বছরের ২০শে সেপ্টেম্বর। সংগে ছিলেন বি-ভির অমলেন্দু (মুকুল) ঘোষ। বর্তমান গ্রন্থ তারই ফলশ্রুতি।

বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে ওখানকার প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় বিমল দাশ গুপ্ত, ফণী দাশ, ফণী কুণ্ডু প্রমুখদের সহযোগিতা আমি অকৃপণ ভাবেই পেয়েছিলাম। সর্বোপরি আমার প্রাপ্তি বি-ভির অন্যতম নায়ক পরম শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়ের সহযোগিতা। ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের ছোট করবো না। এঁরা সে সবের উর্ধে।

মেদিনীপুর অধ্যায়ের অধিকাংশ ছবি তুলে দিয়েছেন ওখানকারই বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মহাপাত্র (বাদলবাবু)। বিভিন্ন ছাত্র-সংস্থার ছবিগুলি দিয়েছেন শ্রীমান সৌমেন দাশ আর সুপতি রায়ের ছবিখানি পেয়েছি সুলেখক সত্যেন ভদ্রের সৌজন্যে। রোম থেকে প্রেরিত পরিমল রায়ের ছবিখানি পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক নির্মল রায়। আর রণেন গাঙ্গুলীর ছবিখানি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত বারীন রায়।

শ্রীযুক্ত প্রভাংশু পাল, নিরঞ্জীব রায় প্রমুখদের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করার মত। বিপ্লবীনায়ক পঞ্চানন চক্রবর্তীর কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম নেতা পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রণেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতা সত্বেও বইটির জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সবাইকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত

গ্রন্থকার

২১ বি ফার্ণরোড,
কলি-১৯

॥ যে সব বই ও পত্রিকা থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে ॥

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব… ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

সবার অলক্ষ্যে… ”

শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য… ঈশান মহাপাত্র

বাংলায় বিপ্লববাদ… নলিনীকিশোর গুহ

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস সুপ্রকাশ রায়

ভারতের বিপ্লব কাহিনী… হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

Two great Indian Revolutionaries....Uma Mukerjee.

History of Midnapore.... Naren Das

আনন্দবাজার পত্রিকা : পূর্ণদাস স্মারক সংখ্যা

ও

অন্যান্য

চলো আমরা একবার মেদিনীপুর থেকে ঘুরে আসি মীরা।

প্রণাম করে আসি, শত শহীদের রক্তে সিক্ত সেই রাঙা মাটির দেশকে, যার প্রতিটি স্তূপের নিচে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে কত নাম না জানা মানুষ, কত অশ্রু, কত চাপাকান্না, কত চক্রান্ত আর শোষণের ইতিহাস।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর উপর দিয়ে অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেছে। কত চেনা মুখ আজ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছে—কত নাম—কত ভুলে যাওয়া মুখ।

তাদের কেউ শাস্তি ভোগ করেছেন লৌহ-কারার অন্তরালে। কেউ গেছেন দ্বীপান্তরে। কেউ বা দণ্ডিত হয়েছেন প্রাণদণ্ডে।

আজ আর সেসব কথা ভাল করে মনেও পড়ে না।

তা বলে শহীদ-তীর্থ মেদিনীপুর কিন্তু তাঁদের কথা কোনদিনই ভোলেনি মীরা। প্রমাণ, শহরের এখানে ওখানে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র।

সারি সারি কত মর্মর মূর্তি। একটার পর একটা। অসংখ্য। তাই বুঝি মেদিনীপুর শহরকে সবাই আজ বলে—City of statues.

চলো, নিজের চোখেই দেখে আসবে সব। রক্ত-সিক্ত মেদিনী-পুরকে কি দূর থেকে চেনা যায়! নাকি চেনা সম্ভব?

আমরা এসে গিয়েছি মীরা। এবার আমাদের নামতে হবে ট্রেন থেকে।

স্টেশন পেরিয়ে প্রথমেই আমরা যাব বা-দিকের রাস্তা ধরে। তারপর অন্যান্য জায়গায়।···

···একটু থামতে হবে এবার আমাদের। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে গিয়েছি।

তাকিয়ে দেখো সামনের ঐ মর্মর মূর্ত্তির দিকে। চিনতে পেরেছ নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, ক্ষুদিরাম। ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম।

“হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।”

একথা ক্ষুদিরামেরই সাজে। সত্যিই সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবাসীকে। দেখিয়েছিলেন, কি করে দেশের জন্য হাসতে হাসতে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

সেই ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্ত্তি। আশ্চর্য্য, ভাস্কর্য্য শিল্পের কি অপূর্ব নিদর্শন। হারিয়ে যাওয়া সেই ক্ষুদিরাম যেন দীর্ঘ বাযট্টি বছর বাদে আজ আবার চোখের সামনে রূপ-রস-মূর্ছনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন।

জায়গাটার নাম আগে ছিল বার্জ টাউন। এখন হয়েছে ‘ক্ষুদিরাম নগর’।

কে এই বার্জ? কেন একদিন তার নামানুসারে এ জায়গাটার নাম রাখা হয়েছিল বার্জ টাউন?

এ প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে আরো পরে।

ক্ষুদিরাম নগর থেকে গোলকুয়া চক্।

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট। এদিকে তখন আলিপুর বোমার মামলার শুনানী চলছে।

বিশ্বাসঘাতকতা করল অন্যতম বন্দী নরেন গোঁসাই। সব কিছুই সে গোপনে ফাঁস করে দিল পুলিসের কাছে।

গর্জে উঠলেন কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই। এর জবাব আমরা দেবোই।

কি করে যে একদিন কানাই আর সত্যেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরেই সেই দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছিলেন, সে কাহিনী তুমিও জানো।

কানাই প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ১০ই নবেম্বর। সত্যেন ২১শে নবেম্বর।

এই সেই ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্ত্তি।

পাশে যাঁর আবক্ষ মূর্ত্তি রয়েছে, তিনি হলেন সত্যেনের অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোলকূয়া চক্-এ এই আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছিল
২১শে নবেম্বর। আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে।

চলো এবার আমরা এগিয়ে যাই কেরাণী টোলার দিকে। ওখানে তুমি দেখতে পাবে অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) আবক্ষ মূর্ত্তি।

অগ্নিযুগের প্রথম পর্বের কথা। বিপ্লবীদের কাছে সবচাইতে বড় সমস্যা হল তখন—অস্ত্র। অস্ত্র চাই। অনেক অস্ত্র। কিন্তু কোথায় পাবে নিরস্ত্র ভারতবাসী এত অস্ত্র ?

পথ দেখালেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)। নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে একদিন তিনি চলে গেলেন সুদূর প্যারিসে। বোমা তৈরীর ফরমূলা শিখতে হবে। বই পড়ে নয়, শিখতে হবে হাতে-কলমে।

তারপর একদিন আলিপুর বোমার মামলার অসামীরূপে ধরা

পড়লেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), ধরা পড়লেন বিপ্লবগুরু অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি সবাই।

প্রধান নেতা অরবিন্দ ঘোষ বার বার নিষেধ করা সত্বেও অপরাধ স্বীকার করলেন বারীন্দ্র ঘোষ। হ্যাঁ, এসব আমিই করিয়েছি। ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীকে আমিই সেদিন পাঠিয়েছিলাম মজঃফরপুরে। 'My mission is over'—তাই যাবার আগে সব কথাই আমি জানিয়ে যেতে চাই দেশবাসীকে।

একই বক্তব্য রাখলেন উল্লাসকর দত্ত এবং উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। অন্যতম প্রধান নেতা বারীন ঘোষ যেখানে সব কিছু স্বীকার করেছেন, সেখানে অস্বীকার করার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

স্বীকার করলেন না এই হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)। গুরু অরবিন্দের মতই তিনি নিজের সঙ্কল্পে অটুই রইলেন সর্বক্ষণ।

সাজা হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তারপর একদিন সুদূর আন্দামান।

এই সেই অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য্য হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) আবক্ষ মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছিল ১৫ই আগষ্ট।

'অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য্য'। বিশেষণটি কার দেয়া জানো মীরা? বিদ্রোহী কবি নজরুলের। তিনিই একদিন এই নামে সম্বোধন করেছিলেন অনমনীয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাসকে (কানুনগো)।

এবার কর্ণেল গোলা।

তাকিয়ে দেখো সামনের দিকে। ঐ যে নেতাজীর পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য্য নেতাজী। নেতাজী জিন্দাবাদ।

ঠিক গায়েই মেদিনীপুর কলেজ। দলীয় নির্দেশে ঢাকা থেকে

এখানে এসে এই কলেজেই সেদিন ভর্ত্তি হয়েছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের বীর যোদ্ধা, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ দীনেশ গুপ্ত। পরের ইতিহাসতো তুমিও জানো।

রাস্তার এপাশে কলেজ, ওপাশে খেলার মাঠ। এবার তাকিয়ে দেখো ঐ খেলার মাঠের দিকে। শুরুতেই চার চারটি আবক্ষ মূর্ত্তি। এই চারজন হলেন দীনেশ গুপ্ত, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত আর নির্মল-জীবন ঘোষ। এদের পরিচয় তুমি পাবে আরো পরে।

এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপন করা হয়েছিল ১০ই মার্চ। উৎসব মুখর মেদিনীপুরের সেদিনের চেহারাটা আজ বোধ হয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

চলো এবার বল্লভপুর। ওখানে রয়েছে শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর আবক্ষ মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৬ই আগষ্ট।

একটু বাঁক ঘুরলেই শহীদের বাসস্থান 'ব্রজকিশোর ভবন।' ওখানেও একবার যেতে হবে বৈকি!

তারপর যাব আমরা ভীমতলাচক। শহীদ রামকৃষ্ণ রায়ের আবক্ষ মূর্তি দেখতে হবে না! দেখতে হবে না মীরবাজারে অবস্থিত ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনের শহীদ বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার আবক্ষ মূর্ত্তি!

রামকৃষ্ণ রায়ের এই আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সবার আগে, ২৫শে আগষ্ট।

কে এই রামকৃষ্ণ রায়? ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীই বা কে?

একটু অপেক্ষা কর। এদের সবার পরিচয়ই তুমি পাবে এ কাহিনীর শেষের দিকে।

সব শেষে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য।

চলো এবার বটতলাচক। ওখানেই প্রদ্যোতের আবক্ষ মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। তারিখটা ছিল ১৯৭০ সালের ৩০শে এপ্রিল।

রিক্‌সাওয়ালা, একটু জোরে চলোনা ভাই। বেলা যে পড়ে এল।

না, থাক। সামনেই 'প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট'। দুপা এগুলেই শহীদের নামাঙ্কিত—'প্রদ্যোৎ ভবন'। চলো, আগে আমরা ওখানে গিয়ে শহীদ জননী পঙ্কজিনী দেবীকে প্রণাম করে আসি। তারপর আমরা যাব বটতলাচকে অবস্থিত প্রদ্যোতের সেই আবক্ষ মূর্ত্তির পাশে। চলো—

কে? কে! কে এসেছ তোমরা! ভেতরে এসো!

শুনতে পাচ্ছ মীরা! শহীদ জননীর কণ্ঠ। তিনি ডাকছেন আমাদের। চলো ভেতরে যাই।

—কাছে এসে বসো। চোখে ভাল দেখতে পাইনে। আরো কাছে এসো। কোন সঙ্কোচ নেই। এতো তোমাদেরই ঘরবাড়ি। আমি তো শুধু প্রদ্যোতের মা নই, তোমাদের সবার মা। যাবার আগে প্রদ্যোৎ আমাকে তাই বলে গেছে।

গোটা ঘরটাতে মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধতা। কথা বলছেন শুধু একজন। বাদবাকী সবাই শ্রোতা।

—জানো বাবা, ঐখানটাতে বসে সে পড়াশুনো করতো। ঐ তাকের উপর তার বইপত্র সব গুছানো থাকতো। কি ভালইনা বাসত পড়াশুনো করতে। রাতদিন শুধু পড়া আর পড়া। হলে কি হবে। ক্ষুদিরামের দেশেরইতো ছেলে। তাই তাঁর মতই একদিন সে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি তুলে নিল নিজের গলায়। না, আমার কোন দুঃখ নেই। আমি যে সবার মা। প্রদ্যোৎ না থাক, তোমরাতো রয়েছো। তাহলে আমার দুঃখ কিসের!

এই সেই বটতলাচক। তাকিয়ে দেখো মীরা। সামনেই প্রদ্যোতের আবক্ষ মূর্ত্তি।

শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য। কত সেদিন বয়স ছিল প্রদ্যোতের। দেখে কিন্তু খুবই অল্প বয়স বলে মনে হয়—তাইনা মীরা।

কিন্তু প্রদ্যোতের ডানহাতটা পেছন দিকে কেন? মনে হয়, কিছু যেন একটা লুকানো রয়েছে ওর হাতে। কি ওটা?

একটা রিভলবার।

কিন্তু কেন? কই, আর কারো হাতে তো রিভলবার নেই! তাহলে প্রদ্যোতের হাতে ঐ রিভলবারটা থাকার কারণ কি?

কারণ আছে বৈকি! প্রদ্যোতের ভাষায়: 'Had my revolver spoken out............the story would have been otherwise.'

• বিস্মৃতপ্রায় অতীতের এক ধূসর পাণ্ডুলিপি। অস্পষ্ট কিন্তু অবিস্মরণীয়।

ফেলে আসা অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় থেকে কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনা আজ তোমাকে আমি নূতন করে শোনাবো মীরা।

এ কোন বাইরের ইতিহাস নয়। এ ঘটনা ঘটেছিল আমাদের বাংলা দেশেই।

১৯৩২ সালের কথা।

সবার মনে সেদিন একই প্রশ্ন:—এবার কার পালা?

প্রশ্নটা শুধু মেদিনীপুরের নয়। গোটা বাংলার। গোটা ভারতবর্ষের।

গত দুবছরে অনেক রক্ত ঝরেছে বাংলার মাটিতে। বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুর লালে লাল হয়ে গেছে বিদেশীর খুনে।

এবার কার পালা?

কাকে এবার মুখ থুবড়ে পড়তে হবে বাংলাদেশের মাটিতে?

কার জীবনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের হাতে?

কে সেই লোক?

দলের নাম 'বি-ভি'। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সংক্ষিপ্ত নাম—'বি-ভি'।

প্রথমে অবশ্য এ নাম ছিল না। তখন কেউ কেউ বলতেন—'হেম ঘোষের পার্টি'।

তার কারণও ছিল। ১৯০৫ সালে হেম ঘোষই এ দল স্থাপন করেছিলেন পূর্ববঙ্গে—ঢাকা শহরে। সংগে ছিলেন—শ্রীশ পাল, রাজেন্দ্রকুমার গুহ, আলিমুদ্দিন সাহেব (মাষ্টার সাহেব), কৃষ্ণ অধিকারী, প্রমথ চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, স্থুরেন বর্ধন, বিভূতি, বসু প্রমুখ গুটিকয়েক সহকর্মী মাত্র।

পেছনে ছিল সাগ্নিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সস্নেহ আশীর্বাদ।

হেম বাবুর নিজের ভাষায়:

"১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের সংগে ঢাকায় আমার প্রথম দেখা। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ পাল। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে কতিপয় বন্ধুসহ দ্বিতীয় দিন আবার তাঁর কাছে যাই। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ পেলাম। অপূর্ব এক চৈতন্যলোকে নিয়ে গেল তাঁর বাণী।"

স্বামীজী বলেছিলেন: "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই! তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহরণকারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।"

সেই দিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লবধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম। [ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়: পৃঃ—৫৪৪]

হেম ঘোষ! নাম শুনে বিভ্রান্ত হয়োনা যেন মীরা। ইতিপূর্বে মেদিনীপুর প্রসঙ্গে যাঁর কথা বলেছি, তিনি হলেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)। ইনি সম্পূর্ণ আলাদা লোক। নাম—হেমচন্দ্র ঘোষ। ঢাকার হেম ঘোষ।

ক্রমশঃ দল বড় হতে লাগল। দলীয় নির্দেশেই একদিন শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস প্রমুখ সদস্যবৃন্দ চলে এলেন কলকাতায়।

শুধু ঢাকা শহরেই দলের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। বাংলাদেশের প্রতিটি উপযুক্ত স্থানে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে হবে।

তখন এই দলের নাম ছিল—'মুক্তিসংঘ'।

কিন্তু সে নাম উচ্চারিত হত সবার অগোচরে অতি সন্তর্পণে। একমাত্র প্রথম সারির কর্মীবৃন্দ ছাড়া আর কারোরই সে নাম জানবার কোন সুযোগ ছিল না। তাই বাইরের লোকে বলতো—'হেম ঘোষের পার্টি'।

গোয়েন্দা দপ্তরের নথীপত্রেও লেখা রয়েছে হেম ঘোষের পার্টি বলেই, 'মুক্তিসংঘ' বলে নয়।

যেমন রডা-অস্ত্রলুণ্ঠনের ঘটনা। স্পষ্টই সেখানে বলা হয়েছে,—এটা হেম ঘোষের পার্টির কাজ। সঙ্গে রয়েছে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি।

ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠন।

বিশ্বাসের অযোগ্য এক কাহিনী। অন্ততঃ সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কাহিনী বিশ্বাস করা খুবই কষ্টকর ছিল।

সেহ অসম্ভবকেই সেদিন সম্ভব করে তুলেছিলেন মুক্তিসংঘের দুর্ধর্ষ এক কর্মনায়ক শ্রীশ পাল।

মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

কোথায় আজ রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের দুরন্ত অধিনায়ক সেই শ্রীশ পাল ?

কোথায় অনুকূল মুখার্জী, খগেন দাস, হাবু মিত্র, গিরীন ব্যানার্জী প্রমুখ বিপ্লবী নায়ক বৃন্দ ?

একমাত্র হরিদাস দত্ত আর সুরেন বর্ধন ছাড়া আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের সেই কীর্তি-কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

১৯১৪ সাল। ইয়োরোপের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে আর খুব একটা বেশী বাকী নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে।

এই তো সুযোগ। যে করে হোক, এ সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। বিপন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে শেষ করে দিয়ে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। পিছিয়ে গেলে চলবে না।

ঘুম নেই মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও সর্বদলীয় নেতা যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) চোখে। আর দেরী নয়। সবাই প্রস্তুত হও। লগ্ন আসন্ন।

দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে দু'জনে দুই প্রান্তে কাজ শুরু করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

রাসবিহারীর প্রধান লক্ষ্য, উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন সেনাবাহিনীর দিকে। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু ওদের আছে। যে করে হোক ওদের দলে টেনে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। তারপর ওদের অস্ত্র দিয়েই পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে ভারতবর্ষ থেকে।

বাঘা যতীনের লক্ষ্য, জার্মানী থেকে গোপনে আগত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলির দিকে। বার্লিন কমিটির মাধ্যমে

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। ম্যাভারিক, এস. হেনরী ইত্যাদি জাহাজগুলি এসে পড়ল বলে। ওগুলি এসে গেলে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য আর কোন ভাবনা নেই।

কিন্তু সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা। প্রাথমিক কাজগুলি শেষ করার জন্য আপাততঃ কিছু নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র চাই। কোথায় পাবে নিরস্ত্র ভারতবাসী সে-সব অস্ত্রশস্ত্র ?

উপায় আছে।

বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যে ডাক পাঠালেন হেম ঘোষের পার্টি এবং আত্মোন্নতি সমিতির নায়কবৃন্দ।

তোমরা সবাই এসো। মস্তবড় খবর এনেছেন আত্মোন্নতি সমিতির একনিষ্ঠকর্ম্মী হাবুভাই (শ্রীশ মিত্র)। এসো, সবাই মিলে আলোচনা করে দেখা যাক যে, এ সুযোগটাকে কাজে লাগানো যায় কিনা ?

ডাক শুনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ একদিন জড়ো হলেন ছাতাওয়ালা গলির একটা গোপন আস্তানায়।

এলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় (নরেন ভট্টাচার্য)। এলেন নরেন ঘোষচৌধুরী, অনুকূল মুখার্জী, হরিদাস দত্ত, আশুতোষ রায়, হাবু মিত্র, খগেন দাস, সুরেশ চক্রবর্তী, জগৎবাবু, বিমান চন্দ্র প্রমুখ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ।—বল এবার তোমাদের কি প্ল্যান ?

জবাব দিলেন হেম ঘোষের পার্টির দুরন্ত কর্মনায়ক শ্রীশ পাল :

—আমাদের প্ল্যান, বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন করা।

—কি করে ?

—আত্মোন্নতি সমিতির হাবুভাই রডা কোম্পানির একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী সে কথা তোমরাও জানো। তার খবর : শীগ্‌গীরই নাকি বিদেশ থেকে আসা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস অফিস থেকে চালান যাবে রডা কোম্পানিতে। তার মধ্যে তিব্বতের দালাই লামার

জন্য প্রেরিত পঞ্চাশটি মারাত্মক মাউজার পিস্তলও থাকবে। মাউজার পিস্তলের গুণাগুণ সবাই তোমরা জানো। দরকার হলে কাঠের বাঁটটা জুড়ে নিয়ে নিমেষে তাকে রাইফেলের মত ব্যবহার করা চলে। তার পাল্লাও বহুদূর পর্যন্ত। এক মাইলেরও বেশি। আমাদের লক্ষ্য হবে ঐ মাউজার পিস্তলগুলি।

—কি করে তা সম্ভব?

—কেন, অসুবিধার কি আছে! কাস্টমস অফিস থেকে রডা কোম্পানিতে মাল যাবে গরুর গাড়িতে। বরাবরই তাই যায়। সুতরাং, যা কিছু করার, ঐ মাঝপথেই করতে হবে।

—আমরা এর মধ্যে নেই। উঠে দাঁড়ালেন প্রখ্যাত বিপ্লবী এম. এন. রায় ও নরেন ঘোষচৌধুরী। অতি অবাস্তব পরিকল্পনা। কাস্টমস অফিস থেকে রডা কোম্পানির দূরত্ব কতটুকুই বা! ডালাহৌসী স্কোয়ারের এ মাথা থেকে ও মাথা মাত্র। প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের মত জনাকীর্ণ স্থানে এমন কাজ কল্পনাই করা যায় না।

আসর ছেড়ে চলে গেলেন এম. এন. রায় এবং নরেন ঘোষ-চৌধুরী। আর ফিরেও তাকালেন না। যদিও কর্মদক্ষতার দিক থেকে কেউ এরা কম নন, কিন্তু এযে একেবারেই অবাস্তব পরিকল্পনা।

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

—তোমরা কি বল ভাই? এবার আত্মোন্নতি সমিতির সদস্যদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন শ্রীশ পাল, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই তো বিপ্লবীর ধর্ম। আমরা কি এতই অক্ষম যে, কাজে নেমে পিছিয়ে যাব?

—আমরা প্রস্তুত।

সবাই সম্মতি জানালেন একবাক্যে। অসম্ভবের নায়ক শ্রীশ পাল যেখানে দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে যত অবাস্তবই মনে হোক না কেন, তার সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অসম্ভবের নায়ক।

কথাটা মিথ্যে নয়, মীরা। সত্যই অসম্ভবের নায়ক ছিলেন এই শ্রীশ পাল। কার্যক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অসংখ্য বার।

যেমন দেশদ্রোহী নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যার বেলায়।

১৯০৮ সন। ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার।

মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ করে রাত্রির অন্ধকারে ঝড়ের মত ছুটে চলেছেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী।

পরদিন ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনি রেল স্টেশনে।

প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন মোকামাঘাট স্টেশনে। কারণ বন্ধুবেশী পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর বিশ্বাস-ঘাতকতা।

গর্জে উঠল বাংলার বিপ্লবী দল। নন্দলাল ব্যানার্জীর ক্ষমা নেই। দেশদ্রোহীকে চরম শাস্তি দিতেই হবে।

খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি তার জন্য।

প্রফুল্ল চাকী আত্মবিসর্জন করলেন ১৯০৮ সনের ২রা মে। মাত্র ছয় মাস। তারপরই একদিন চরমদণ্ড মাথা পেতে নিতে হল বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল ব্যানার্জীকে।

তারিখটা ছিল ১৯০৮ সনের ৯ই নবেম্বর।

রাত তখন প্রায় সাতটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সার্পেন্টাইন লেন ধরে এগিয়ে চলেছেন নন্দলাল।

মন তার খুশিতে ভরপুর। সরকারের কাছ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার মিলেছে। চাকরিতে পদোন্নতি ঘটেছে। সুতরাং আর তাকে পায় কে!

হঠাৎ নন্দলালের মাথার উপর আকাশটা ভেঙে পড়ল শব্দ করে। ব্যস, সব শেষ। নন্দলাল খতম।

কে সেদিন চরম শাস্তি দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতক নন্দলালকে ?

নরেন, অর্থাৎ ছদ্মবেশী শ্রীশ পাল। সঙ্গে ছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির একজন তরুণ বিপ্লবী রণেন গাঙ্গুলী।

পুলিস কোনদিনই জানতে পারেনি তাদের নাম। শুধু পুলিস কেন, দলের মধ্যেও অনেকেই জানতে পারেননি এ খবর।

অন্যতম নায়ক রণেন গাঙ্গুলী আজো বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যে। গত ২৭শে আগষ্ট মহাজাতি সদনের অছি-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত টেপ্ রেকর্ডে এ প্রসঙ্গে তিনি কি বলেছেন শোন ঃ

"এ কাজটি এমন দক্ষতায় ও সংগোপনে সাধিত হয় যে, পুলিস এর কোন হদিশই পায়নি। কাজেই তাদের খাতায় নন্দলাল নিধন-কারীর নাম নেই। কোন বিপ্লবীদল থেকে এ কাজ করা হয়েছিল তারও কোন সঠিক তথ্য নেই। আমরা কয়েকজন ছাড়া বিপ্লবী দল-গুলোর কাছেও এ তথ্য উদ্ঘাটিত ছিল না। ফলে স্পেকুলেশানের অন্ত নেই। নানা জায়গায় দায়িত্বশীল লোকেরাও শোনা কাহিনী থেকে ভুল ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন।

দেখে-শুনে আমি স্তম্ভিত হই। অথচ আজও ঐ ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী আমি রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী জীবিত আছি। উল্লিখিত ইতিহাস-স্রষ্টারা ভুলেও আমার খোঁজ করেন নি। কিন্তু যেসব লেখক আমার খোঁজ করে ঘটনা জেনেছেন, তাঁরা যথার্থ তথ্যই পরিবেশন করতে পেরেছেন। যাক গে, ঘটনাটি সংক্ষেপে বলছি...

নন্দলাল হত্যা সংঘটিত হয় ১৯০৮ সালের ৯ই নবেম্বর। এই কাজটি করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয় তৎকালীন বিপ্লবীদলের উপরতলা থেকে।

কর্মের পরিকল্পনা ও দায়িত্বভার প্রথমটায় বহন করতে দেখেছিলাম আত্মোন্নতি সমিতির হরিশ সিকদার মহাশয়কে। তিনিই আমাকে গোপনে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নন্দলালের উপর নজর রাখতে, তাকে হত্যা করার প্রয়োজনে। আমি দিনের পর দিন নজর রাখি এবং যথাস্থানে সংবাদ দিতে থাকি।

এদিকে এ-ও জানলাম যে, ঢাকার বিপ্লবী মুক্তিসংঘের (পরবর্তী-কালে বি. ভি.) নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে বৈপ্লবিক সংযোগ রাখছেন। ক্রমশঃ আমাকে জানানো হল যে, ঐ সংস্থার শ্রীশচন্দ্র পাল ও আমি একসঙ্গে যাব নন্দলালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

শ্রীশবাবু ও হরিশবাবুর বন্ধুত্ব এবং political understanding ছিল গভীর। শ্রীশ পালের কর্ম্মনেতৃত্ব ছিল অসাধারণ। সাহসে তিনি ছিলেন দুর্জয়।

এল ৯ই নবেম্বর।

আমাদের প্রাপ্ত সংবাদ মত নন্দলালকে পাওয়া গেল সার্পেণ্টাইন লেনে। সশস্ত্র শ্রীশ পালের সঙ্গে আমিও নন্দলালকে অনুসরণ করছি। বর্তমান সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের পাশে সুবিধামত অবস্থায় শ্রীশ পাল সর্বপ্রথম নন্দলালকে গুলি করলেন।

নন্দলালের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা সাতটা। দেশদ্রোহী নন্দলাল মরে গিয়েও যাতে আবার বেঁচে না ওঠে এই আশঙ্কায় আমিও ছুটে গিয়ে আমার রিভলবার দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলাম।

কাজ সমাপ্ত হতেই আমরা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। শ্রীশ পাল বা আমার এ কাহিনী পুলিস তো দূরের কথা, দলের কর্মীরাও জানতে পারেন নি।"

ঠিক একই বক্তব্য রেখেছেন ঐতিহাসিক উমা মুখার্জী। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত "Two Great Indian Revolutionaries" গ্রন্থে কি বলেছেন শোন : "...At the appointed hour Ranen and Naren (Srish Pal) set out and waited before the old Siva temple cracking and taking ground-nuts, and shortly after finding Nandalal Banerjee coming out of his house they moved forward.

It was Naren (Srish Pal) who actually killed **Nandalal just at the S. W. corner of St. James Park at about 7 p. m. To be sure of the accomplished murder Ranen also struck the head of the man with his own revolver."**

"যথাসময়ে রণেন এবং শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) পুরনো শিবমন্দিরের কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। উভয়ে চিনে-বাদাম ভেঙে খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে নন্দলালকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে তারাও এগোতে লাগলেন।

সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসতেই শ্রীশ পাল তাকে গুলির আঘাতে হত্যা করেন। রাত তখন প্রায় সাতটা।

অধিকতর নিঃসন্দেহ হবার জন্য রণেন তার মাথায় রিভলবার দিয়ে সজোরে আঘাত করেন।"

এখানেই শেষ নয়। আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম প্রধান নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে পরবর্তীকালে আরো একটি বিশ্বাসঘাতক মুরারী মিত্রকেও একদিন তার বাড়ির দরজায় লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল এই শ্রীশ পালেরই অব্যর্থ গুলীতে। সেদিনও তার সঙ্গে ছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির একজন দুঃসাহসী তরুণ খগেশ চ্যাটার্জী।*

সেই হেম ঘোষের পার্টি এবং আত্মোন্নতি সমিতি।

বরাবরের মত এবারও তারা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলালেন রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে।

ঠিক হল, এ অভিযানে নেতৃত্ব করবেন স্বয়ং শ্রীশ পাল। সহযোগিতা করবেন উভয় দলেরই বিশ্বস্ত সদস্যবৃন্দ।

দূর থেকে সমর্থন জানালেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী নায়কবৃন্দ।

কাজটা শক্ত সন্দেহ নেই। তবে শ্রীশ পাল যখন রয়েছে, তখন হতাশ হবার কোন কারণ নেই। চেষ্টা করে যাও। আমাদের শুভেচ্ছা রইল তোমাদের ঘিরে।

শুরু হল পরিকল্পনার কাজ।

যে করে হোক, ঐ মাউজার পিস্তলগুলি আমাদের চাই-ই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসি স্কোয়ারের মত জায়গায় এ কাজ করা সহজসাধ্য নয়।

কি করা যায় বল? কোম্পানির কর্মচারী হাবুভাইয়ের খবর: ২৬শে আগস্ট তারিখে মোট সাত গাড়ি বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র কাস্টমস অফিস থেকে যাবে রডা কোম্পানিতে। কোম্পানির তরফ থেকে বরাবরের মত এবারও গাড়ির ব্যবস্থা করবেন হাবুভাই নিজেই।

বাস, সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার প্ল্যান এসে গেল শ্রীশ পালের মাথায়।

সাতটি নয়, হাবুভাই ব্যবস্থা করবেন মোট ছ'টি গাড়ি। বাকী একটির ব্যবস্থা করব আমরা নিজেরাই। সে গাড়িটি থাকবে সবার শেষে। হাবুভাই কায়দা করে সে গাড়িতেই মাউজার পিস্তলগুলি তুলে দেবে। তারপর গাড়ি নিয়ে মাঝপথে হাওয়া। সুতরাং সর্বাগ্রে চাই নিজেদের একটি গরুর গাড়ি। গাড়ির কি ব্যবস্থা হবে বল?

—গাড়ির জন্য ভাবতে হবে না। দায়িত্ব নিলেন আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম নায়ক অনুকূল মুখার্জী,—সে ব্যবস্থা আমিই করে দেব। কিন্তু গাড়োয়ান! বিশ্বস্ত একজন গাড়োয়ান না পেলে কি করে চলবে?

—গাড়োয়ানের জন্য ভাবনা নেই। হাসলেন শ্রীশ পাল, পাকা গাড়োয়ানই আমি দেব। যাকে বলে একেবারে জাত গাড়োয়ান। যাক, আর দেরী নয়। তুমি গাড়ির ব্যবস্থা করো।

১৯১৪ সন। ২৫শে আগস্ট। আর একদিন মাত্র বাকী।

সেদিন রাত্রে দলীয় সদস্য হরিদাস দত্ত সহ মার্কাস স্কোয়ারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত মাড়োয়াড়ী হোস্টেলের শুভার্থীবন্ধু প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার কাছে গিয়ে হাজির হলেন শ্রীশ পাল। হরিদাস আজ রাত্রে তোমার এখানেই থাকবে। আর কাল ভোরে ওকে পয়লা নম্বরের একটি হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের সাজে সাজিয়ে দেবে। দেখো, কোথাও যেন ভুলচুক না হয়।

পরদিন ভোরে হরিদাস দত্তকে দেখে শ্রীশ পাল অবাক। কোথায় সেই হরিদাস দত্ত।

মাথায় তেলজবজবে কদমছাঁট চুল। গলায় মানানসই ধুক্‌ধুকি। পরণে সাত্তহাত কোরা কাপড়। দেখে চেনাই যায় না। মনে হয়, ঠিক যেন একটি পাকা পশ্চিমা গাড়োয়ান। এইমাত্র কলকাতায় এসেছে দেহাত থেকে।

২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সন।

পরপর ছ'খানি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাস্টমস অফিসের দরজায়। মাঝখানে খানিকটা ফাঁক।

তারপর সপ্তম গাড়িটি, যার গাড়োয়ান আসলে হরিদাস দত্ত ছাড়া আর কেউ নন।

পরিকল্পনা মত প্রথমেই দু'টি গাড়িতে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে দিলেন হাবুভাই। তারপরই এগিয়ে গিয়ে সপ্তম গাড়ির গাড়োয়ানটির উদ্দেশ্যে জোর ধমক : ইয়ে উল্লুককা পাঠ্‌ঠা, জলদি কাহে আয়া নেহি ?

—হুজুর মেহেরবান। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেন ছদ্মবেশী গাড়োয়ান হরিদাস দত্ত।

নিখুঁত পরিকল্পনা, তাই কোথাও এতটুকু ভুলচুক হল না হাবুভাইয়ের।

বেছে বেছে ঠিক মাউজার পিস্তল ভর্তি কাঠের বাক্সগুলিই তিনি তুলে দিলেন হরিদাস দত্তর গাড়িতে। সঙ্গে দিলেন পঞ্চাশ হাজার বুলেট। তারপরই আবার ধমক:

উল্লুককা মাফিক হিঁয়া পর খাড়া রহা কাহে? জলদি স্টার্ট করো। সোজা চলে যাও আমাদের ভ্যানসিটার্ট রোডের বড়া অফিসে।

জনাকীর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ার।

যথানিয়মে সাতখানা গাড়ি এগিয়ে চলেছে রাজপথের বুক বেয়ে। আগে সেই একই কায়দায়। এগিয়ে ছ'খানা। মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান। তারপর আদি এবং অকৃত্রিম গাড়োয়ান হরিদাস দত্ত পরিচালিত সেই সাত নম্বর গাড়ি।

অন্যমনস্কতার ভান করে ফুটপাতে হেঁটে চলেছেন স্বয়ং শ্রীশ পাল এবং হেম ঘোষের পার্টির আর একটি বিপ্লবী তরুণ খগেন দাস।

চোখে শাণিত জানোয়ারের দৃষ্টি। পকেটে গুলিভর্তি রিভলভার। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই মাউজার পিস্তলগুলি আমাদের চাই-ই। জান কবুল। গাড়োয়ানবেশী হরিদাস দত্তকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই ভাবেই।

বাধা এলে সামনে আমরা গুলি চালাব দুদিক থেকে। সেই ফাঁকে শাবল দিয়ে বাক্স ভেঙে পিস্তলগুলি লোড করে তুমি তুলে দেবে আমাদের হাতে। তারপর দেখিয়ে দেব ওদের, লড়াই কাকে বলে।

কাস্টমস অফিস থেকে ভ্যানসিটার্ট রোডে অবস্থিত রডা কোম্পানি কতটুকুই বা পথ! ডালহৌসী স্কোয়ারের ওমাথা থেকে এমাথা মাত্র।

পরপর ছ'টা গাড়ি ভ্যানসিটার্ট রোডে ঢুকে যেতেই হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন কোম্পানির মালবাবু হাবুভাই। এতনা দের্ কাহে উল্লুক কাঁহাকা। আভি মাল উতারো। জলদি হাত লাগাও। কুইক্।

সুরু হল মাল খালাসের কাজ।

পরিকল্পনা মত ততক্ষণে শেষের সাত নম্বর গাড়িটি মিশন রো—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট—বেন্টিক ষ্ট্রীট অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে আসল জায়গায়—মলঙ্গা লেনে।

পরবর্তী দায়িত্ব আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম নেতা অনুকূল মুখার্জীর।

বলা বাহুল্য যে, সেখানেও কোনরকম ভুলচুক হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে দলীয় সদস্য কালিদাসবাবুর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে মালগুলি দফায় দফায় পাচার করে দিলেন অন্যতম সদস্য জেলেপাড়ার ভূজঙ্গ ধরের বাড়িতে। ব্যস. কেল্লা ফতে।

শ্রীশ পালের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। সবাই এড়ালেও হাবুভাইয়ের পক্ষে এড়ানো সম্ভব হবে না এত সহজে। কারণ, তিনিই রডা কোম্পানির মালবাবু। যে করে হোক, পুলিশের হিংস্র থাবা থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে।

সেদিনই বিকেলে হাবুভাইকে নিয়ে দার্জিলিং মেলে চেপে বসলেন শ্রীশ পাল। দলের প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম ডাঃ সুরেন বর্ধন বাস করেন রংপুর জেলার নাগেশ্বরীতে। আপাততঃ তাঁর কাছেই হাবুভাইকে রেখে আসা যাক। তারপর যা হয় পরে দেখা যাবে।

সুরেনবাবুর কাছে হাবুভাইকে রেখে পরদিনই আবার কলকাতায় ফিরে এলেন শ্রীশ পাল। শুধু অস্ত্র-শস্ত্র দখল করলেই চলবে না। এবার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত [illegible] গুলিকে বিভিন্ন
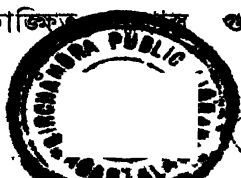
দলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে সমানভাবে। কেউ যেন বাদ না যায়।

এইখানেই রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের বিশেষত্ব।

প্রকৃতপক্ষে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দুটি মাত্র দল। হেম ঘোষের পার্টি এবং আত্মোন্নতি সমিতি।

তাবলে কোনদিনই কিন্তু সেগুলি তারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, মীরা। সবগুলি দলকেই তারা সেই অস্ত্র-শস্ত্রগুলি ভাগ করে দিয়েছিলেন সমান ভাবে।

কারণ—লক্ষ্য সবারই এক। সবারই অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োজন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাইকে সমানভাবে পাল্লা না দিলে চলবে কেন?

ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী।

এতদিন অস্ত্রাভাব ছিল, কিন্তু এবার নেই। অস্ত্র তাদের মুঠোয়। কার সাধ্য তখন তাদের গতি রোধ করে?

কাজেও তাই হয়েছিল। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত বেশির ভাগ অভিযানেই তাদের ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল এই মারাত্মক অস্ত্র মাউজার পিস্তল গুলিকে।

এমন কি বাঘা যতীনও তার ব্যতিক্রম নন। এই মাউজার পিস্তল নিয়েই যে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে কাহিনী তো তুমিও জানো।

ওদিকে ততক্ষণে হুলুস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে শাসক মহলে।

মারাত্মক খবর। পঞ্চাশ হাজার টোটা সহ রডা কোম্পানির পঞ্চাশটি মারাত্মক মাউজার পিস্তল নিখোঁজ। তাদের মালবাবু হাবুভাইয়েরও কোন পাত্তা নেই। এ যে ভয়ঙ্কর কথা।

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। যে করে হোক মালবাবুকে খুঁজে বের করা চাই-ই। রহস্যের আসল চাবিকাঠি রয়েছে তার কাছেই।

কিন্তু কোথায় মালবাবু হাবুভাই !

তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান মেলেনি। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।

তাইতো! ভাবনায় পড়ে গেল শাসক সম্প্রদায়। কোথায় গেল মানুষটা। ঠিক আছে, কার কার সঙ্গে তার মেলামেশা ছিল, খুঁজে বের করো।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন শ্রীশ পাল।

অস্ত্র-শস্ত্র বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিলেও ২১,২০০ রাউণ্ড বুলেট তখনো ভুজঙ্গ ধরের বাড়ি থেকে অন্যত্র পাচার করা সম্ভব হয়নি। ওগুলো অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা দরকার।

যে কথা সেই কাজ। অবিলম্বে একটি গুদামঘর ভাড়া করা হল বড়বাজারের বাঁশতলা অঞ্চলে। বুলেটগুলি রাখা হল সেই গুদামঘরেরই এক কোণে।

বিপদ এল অন্যদিক থেকে। আচমকা একদিন সারা শহরে ঢোল সহযোগে জানানো হলঃ বাড়িতে কোন নতুন ভাড়াটে এলে সঙ্গে সঙ্গেই তার বিস্তৃত বিবরণ নিকটস্থ থানায় জানাতে হবে।

ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। স্বভাবতঃই বাঁশতলা অঞ্চলে গুদাম ভাড়া নেবার খবর একদিন পৌঁছে গেল পুলিশের কানে।

ভাবনায় পড়ে গেলেন শ্রীশ পাল। তাড়াতাড়ি তিনি হরিদাস দত্তকে পাঠিয়ে দিলেন বাঁশতলার গুদামে। অবিলম্বে তুমি ওখান থেকে বুলেটগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর। আর বাড়িওয়ালাকে বলে দাও যে, আমাদের আর গুদামঘরের কোন প্রয়োজন হবে না।

ফাঁদ পাতাই ছিল, যথাস্থানে যেতেই বাড়ির দারোয়ান শুকদেওয়ের

ইঙ্গিতে পাঞ্জাবী পুলিশ কনস্টেবল আলি হোসেনের হুকুম হল—চলিয়ে থানামে।

বেশ চল। বাধ্য ছেলের মতই রাজী হয়ে গেলেন হরিদাস দত্ত, তারপর রাস্তার একপাশে রক্ষিত বালির স্তূপ থেকে অলক্ষ্যে একমুঠি বালি তুলে নিয়ে আচমকা আলি হোসেনের চোখে-মুখে ছুঁড়ে দিয়েই ভোঁ দৌড়।

তবু শেষরক্ষা হল না। সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে রব উঠল—পাকড়ো! পাকড়ো! ডাকু ভাগতা হায়।

একে বড় বাজারের মত ঘিঞ্জি জায়গা, তার উপর দিনের বেলা। তাই হাঁক শুনে চারিদিক থেকে লোক ছুটে এল পিল পিল করে। ফলে ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের গাড়োয়ান সাহেব সত্য সত্যই এবার বন্দী হলেন পুলিশের হাতে।

খবর শুনে হন্তদন্ত হয়ে জোড়াবাগান থানায় এসে দত্তমশাইকে দেখেই উল্লাসে ফেটে পড়লেন দুর্দান্ত পুলিশ শাসক টেগার্ট সাহেব।

"Hallo, Royal Bengal Tiger! Now you are bagged."

কিন্তু প্রমাণ! তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হল রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে, কিন্তু না, সন্দেহজনক কোন প্রমাণই তার কাছে পাওয়া গেল না।

অথচ প্রমাণ ছিল। খুব ভাল প্রমাণই ছিল। সে প্রমাণ হল—গুদামের চাবি।

কিন্তু থানায় আসতে আসতে সবার অলক্ষ্যে চাবিটা একটা আধখোলা ম্যানহোলের মধ্যে টুক করে ফেলে দিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার মোটেই ভুল করেন নি। করেন নি বলেই রক্ষে। নইলে দায়িত্ব এড়ানো সত্যই কষ্টকর ছিল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে নিয়ে এবার বিরাট এক

পুলিশ-বাহিনী গিয়ে হাজির হল সেই গুদামের সামনে। ভাঙ দরজা। সমস্ত পিস্তল ও বুলেটগুলি ওরা এখানেই লুকিয়ে রেখেছে। শীগ্‌গীর ওগুলি বের কর ওখান থেকে।

কোথায় পিস্তল!

তন্নতন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু কেবল মাত্র ২১,২০০ বুলেট ছাড়া আর কিছুই ওখানে পাওয়া গেল না।

পুলিশ-বাহিনী অবাক। তাইতো! পিস্তলগুলি তাহলে কোথায় গেল!

কি ব্যাপার।

ওদিকে তখন পরিস্থিতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছেন শ্রীশ পাল।

হরিদাস ধরা পড়েছে। এদিকে অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু, গিরীন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, আশুতোষ রায় প্রমুখকেও ধরা হয়েছে সন্দেহের বশে।

সুতরাং আর দেরী নয়। হাবুভাই ডাঃ সুরেন বর্ধনের কাছে রয়েছে। এ সম্বন্ধে তাকে একটু সতর্ক করে দেওয়া দরকার।

সাবধানের মার নেই, তাই মুহূর্ত দেরী না করে গোপনে ডাঃ সুরেন বর্ধনের কাছে নির্দেশ পাঠালেন শ্রীশ পাল—হাবুভাইকে তোমার ওখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দাও অবিলম্বে। পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়।

একই খবর পাওয়া গেল ওখানকার থানার পরিচিত মহল থেকে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলে শাসকদের মধ্যেও তার গুণমুগ্ধ বন্ধুর সংখ্যা অল্প ছিল না। তাদেরই একজন একদিন খবরটা পৌঁছে দিলেন সুরেন বর্ধনের কানে।

একটু সাবধানে থাকবেন ডাক্তারবাবু। দু একদিনের মধ্যেই

আপনার বাড়ি সার্চ করতে হবে বলে উপর থেকে অর্ডার এসেছে। তেমন কিছু থাকলে সরিয়ে ফেলুন।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ বর্ধন তার একান্ত অনুগত আসামের পার্বত্য জাতি 'রাভা'দের আস্তানায় পাঠিয়ে দিলেন হাবুভাইকে। থাকুক ওখানে কিছুদিন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। ঠিক তার পরদিনই পুলিশ গিয়ে হাজির। হাবুভাই কোথায় বলুন?

হাবুভাই! যেন আকাশ থেকে পড়লেন ডাঃ বর্ধন, কার কথা বলছেন আপনারা?

কেন, গতকাল পর্যন্ত আপনার বাড়ীতে কি কোন বাইরের লোক ছিল না?

ছিল বৈ কি! কিন্তু সে বাইরের লোক হতে যাবে কেন? সে তো আমার মাসতুতো ভাই সুধীর মিত্র। বিশ্বাস না হয় তো ছোট দারোগাবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না!

তখনকার মত পুলিশ ফিরে গেলেও একটা চঞ্চল জিজ্ঞাসা কিন্তু তাদের মনে জেগেই রইল সর্বক্ষণ।

লোকটির উপর নজর রাখা দরকার। কোথায় যেন ওর মুখোশের আড়ালে অন্য একটি মানুষ রয়ে গেছে, যাকে চট করে বোঝা না গেলেও উপলব্ধি করা যায়।

ঠিক আছে, ফাঁদ তৈরীই রইল। যাবে আর কোথায়?

শুরু হল মামলা।

মামলা চলল সাত মাস ধরে। নাম তার 'রডা আর্মস কন্সপিরেসি'।

আমাদের দেশে এই রডা অস্ত্র লুণ্ঠন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা আছে, মীরা।

কেউ বলেন, এটা অমুক দলের কাজ। আবার কারো মতে—না, এটা অমুক পার্টির অ্যাকশন।

এর কোনটাই ঠিক নয়। কারণ সেদিনের সেই ছদ্মবেশী গাড়োয়ান পরম শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্ত ও ডাঃ সুরেন বর্ধন আজো আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন।

তাছাড়া পুলিশ রিপোর্ট। উভয় পক্ষের বক্তব্যই এ ব্যাপারে এক ওঁ অভিন্ন। সুতরাং দীর্ঘদিন আগেকার ঘটনা হলেও এ সম্বন্ধে ভুল-ভ্রান্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রডা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সেদিন দুর্ধর্ষ পুলিশকর্তা টেগার্ট কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক উমা মুখার্জীর গ্রন্থ থেকে তা এখানে তুলে দিচ্ছি :

Our enquiries showed that the members of Hem Ghosh's party had amalgamated in Calcutta with the remnants of the old Attonnati Samiti [Tegart's Printed note on the Revolutionary movement in Rangpur, dated march 1, 1915.]

অর্থাৎ—আমাদের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের পার্টি প্রাচীন আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে কলকাতায় এসে মিলিত হয়েছে।

এখানেই থামেননি টেগার্ট। তিনি আরো বলেছেন :

"The gang responsible for this theft is connected with Hem Ghosh's Party in Dacca." [Note of mr. Tegart to Mr. Calson, Sept. I, 1914. I.B. Records of the Govt. of W. Bengal. F. N. 1030/1914.]

সোজা কথায়—যাঁরা এই অপহরণের কার্যটি সুসম্পন্ন করেছেন, তাঁরা ঢাকার হেম ঘোষের পার্টির লোক।

এ সম্বন্ধে টেগার্ট আরো কি মন্তব্য করেছেন শোন :

"The Conspiracy which culminated in this theft

commenced in March, 1941, when we received information from a confidential source to the effect that two prominent members of Hem Ghosh's party named Haridas Datta and Khagen Das, had been sent to Calcutta by Hem Ghosh with the object of arranging an assassination on behalf of the revolutionary party." [Vide, F. N. 2391/15 of the I.B. records, Govt. of W. Bengal.]

অর্থাৎ—দীর্ঘ এক ষড়যন্ত্রের পরিণতি হল ১৯১৪ সনে অনুষ্ঠিত রডা অস্ত্র অপহরণ। ঠিক তখনই আমরা বিশেষ একটি সূত্র থেকে জানতে পারি যে, হেম ঘোষের পার্টির দুজন নাম-করা সদস্য হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে গুপ্তহত্যা সংঘটিত করা।

অভিযোগ সত্য।

হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস যে সেদিন জগদ্দলের আলেকজান্দার জুট মিলের কুখ্যাত ও'ব্রায়েনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এ ঘটনা ঘটেছিল তারো দু'বছর আগে, ১৯১১ সনে।

খবর শুনে সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ।

ও'ব্রায়েন নাকি মিলের একজন বাঙালী কেরানীকে হত্যা করেছেন লাথি মেরে। বিচারে তার সাজা হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড।

শুনেই রুষ্ট বাঘের মত গর্জে উঠলেন শ্রীশ পাল, হরিশ শিকদার প্রমুখ হেম ঘোষের পার্টি এবং অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সাহেব মারলে আমাদের ফাঁসি যেতে হয়, আর একজন বাঙালী হত্যার জন্য সাহেবের হল কিনা মাত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমানা! অসহ্য! অসহ্য! ও'ব্রায়েনকে নিজের রক্ত দিয়েই এর প্রায়শ্চিত্ত

করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলার যৌবন এখনো মরে যায়নি।

দলীয় নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাস সেই জুট মিলে গিয়ে ভর্তি হলেন নগণ্য কুলির কাজে। পকেটে গুলিভরা পিস্তল তৈরী আছে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

কিন্তু সব বৃথা। একে একে তিনমাস কেটে গেল, কিন্তু কোথায় ও'ব্রায়েন! কোন চিহ্নও দেখা গেল না তার আশেপাশে। কারণ, পুলিশের সতর্ক নির্দেশ।

খুব হুঁশিয়ার ও'ব্রায়েন সাহেব। নইলে পরে পস্তাতে হবে তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন গা-ঢাকা দিলেন জুট মিল থেকে। যে ভাবেই হোক, পুলিশ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। সুতরাং আর কোন রকমেই এখানে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই হল আসল ঘটনা! এ প্রসঙ্গে টেগার্ট যা লিখেছেন, কোথাও তার মধ্যে এতটুকু ভুল-ভ্রান্তি নেই। ও'ব্রায়েনকে হত্যা করার জন্য সেদিন সত্যিই অধীর হয়ে উঠেছিলেন শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, হরিশ শিকদার প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

যাক, পরের কাহিনী শোন।

মামলা চলল দীর্ঘ দিন ধরে।

বিরাট আয়োজন। বিরাট প্রস্তুতি। অর্থব্যয়ও করা হল বিস্তর।

তবু খুব একটা সুবিধে হল না সরকার পক্ষের। একমাত্র চিহ্নিত আসামী হাবুভাই পলাতক! সুতরাং তেমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত হরিদাস দত্তকে দু'দফায় দেওয়া হল মোট চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জীর দু' বছর। সন্দেহের অবকাশে বাদবাকী আসামী সবাই মুক্ত।

অভিযানের মূল নায়ক শ্রীশ পাল ধরা পড়লেন ১৯১৬ সনের প্রথম দিকে। প্রমাণের অভাবে মামলা না করে তাঁকে করা হল স্টেট প্রিজনার।

আর হাবুভাই? তাঁর কি হল?

না, কোন খবর নেই। সেই যে তিনি একদিন সুরেন বর্ধনের আশ্রয় থেকে আসামের রাভাদের মধ্যে চলে গেলেন, সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। তারপর আর কোন খবরই তাঁর পাওয়া যায়নি। খবর পাওয়া যায়নি তাঁর সঙ্গী একজন রাভা যুবকেরও।

কেউ কেউ বলেন, তাঁরা নাকি চীন বর্ডার অতিক্রম করতে গিয়ে সীমান্ত রক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন বন্যজন্তুর আক্রমণে। কোনটা যে সত্য, তার সঠিক মীমাংসা আজো হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুরেন বর্ধন পরবর্তীকালে কি বক্তব্য রেখেছেন শোন ঃ

"শ্রীশদা হাবুকে সঙ্গে করিয়া মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যার পরে কুলীর বেশে আমার ওখানে (নাগেশ্বরী, রংপুর) আসেন এবং পরদিনই ভোরে হাবুকে রাখিয়া তিনি কলিকাতার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া যান।

হাবু আমার কাছে মাস দুই ছিল। প্রথমে একটু সংগোপনেই থাকিত কিন্তু স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া শেষটায় সে আমার কথা শুনিত না, আমার ঘোড়া লইয়া ছুটাছুটি করিত।

গ্রামের সকলের সঙ্গেই সে মেলামেশা শুরু করিল। ফলে সকলের নজরে পড়িয়া গেল, বিশেষতঃ থানার লোকদের।

আমার উপর পুলিশের কিছু দৃষ্টি ছিল, তদুপরি নতুন লোক দেখিয়া এবং উহার মুখে খাস কলিকাতার কথা শুনিয়া পুলিশের সন্দেহ দানা বাঁধিয়া উঠে। আমি অন্ততঃ পুলিশের গতিবিধি দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম।

থানার সহকারী দারোগা আমার অনুগত ছিল। একদিন সে আমাকে জানাইল যে, কলিকাতা হইতে আই. বি. পুলিশ আসিতেছে, বোধহয় আমার বাড়ি সার্চ হইবে।

আমি সেইদিনই সন্ধ্যায় হাবুকে হরিদাস দত্তর ছোটভাই যামিনী দত্ত ও আমার বিশেষ বন্ধু ও একান্ত বিশ্বাসী নীলকমল বৈরাগীর হেফাজতে আসাম সীমান্তে রাভাদের নিকট পাঠাইয়া দেই।

পরের দিনই পুলিশ আমার বাড়িঘর ও ডিস্পেন্সারি তল্লাসি করিতে আসে এবং হাবু মিত্রকে না পাইয়া বড়ই হতাশ হয়।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বলিয়াছিলাম যে, আমার কাছে আমারই এক মাসতুতো ভাই ছিল; হাবু মিত্র বলিয়া কেহ নহে, সেই ভাই চাকুরির উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল এবং চাকুরি না পাওয়ায় গত রাত্রিতে চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে দুইজন আই. বি. অফিসার আসিয়া এই তল্লাসি পরিচালনা করে। হাবুকে না পাইয়া তাহারা স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহারা বলিল যে, গতরাত্রে ১০টা পর্য্যন্ত তাহাদের লোক এক ব্যক্তিকে আমার বাড়িতে দেখিয়াছে, ইতিমধ্যে ঐ লোক কোথায় যাইতে পারে?

যাহা হউক, আমার বাড়িঘরের মেঝে ও জমি বিস্তর খুঁড়িয়াও পুলিশ তাহাদের পছন্দসই কোনকিছু না পাইয়া শেষটায় চলিয়া গেল। ইহার পর বহুদিন ধরিয়া নানাদিকে লোক পাঠাইয়া পুলিশ হাবু মিত্রের খোঁজ করিয়াছিল। এবং আমাকেও কড়া নজরে রাখিয়াছিল।

হাবুর সঙ্গী আমাদের বন্ধু একটি রাভা যুবক ছিল। দীর্ঘকাল কয়েদখানায় থাকার পর আমরা সকলে বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া আসাম সীমান্তবাসী রাভাদের আস্তানায় খোঁজ লইয়া জানিতে পারি যে, হাবু এবং উক্ত রাভা যুবক ঐ আস্তানা হইতে বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

উহারা কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। তবে রাভাদেরও ধারণা যে, উহারা পাহাড়ের দিকেই গিয়াছে। সুতরাং হাবুর শেষ পরিণতি অজ্ঞাত ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে বলিয়া আমারও ধারণা। তাহার মত প্রাণবন্ত, সাহসী ও দুর্দান্ত যুবকের পক্ষে এরূপ চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

আমরা দীর্ঘকাল জেলে থাকার জন্যই হাবুর মত কর্মী নিখোঁজ হইয়া গেল। ইহা আজও আমার কাছে একটি কঠিন বেদনাদায়ক বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তবে যে ভাবেই হউক, দুর্গমস্থানে তাহার মৃত্যু যে শহীদের মৃত্যু হইয়াছে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।" [সবার অলক্ষ্যে ঃ (প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় ঃ পৃঃ ২৯৮-৩০১]

অগ্নিযুগ !

শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—মহারাষ্ট্রে। বাংলায় তার প্রথম প্রকাশ ১৯০৮ সনে ক্ষুদিরামের ঘটনার মধ্য দিয়ে। তার চরম পরিণতি ঘটেছে ইম্ফলের রণাঙ্গণে।

দীর্ঘ এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে রডা কোম্পানির সেই মারাত্মক পিস্তলগুলি, যে মোট কতবার ঝলসে উঠেছিল কে তার খবর রাখে ?

কে খবর রাখে যে, সেদিন কারা এই মাউজার পিস্তলগুলি দখল করে অগ্নিযুগের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন সর্বস্ব পণ করে ?

জানে কি কেউ হাবুভাই, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, অনুকূল মুখার্জী, সুরেন বর্ধন প্রমুখ বিপ্লবীদের নাম ?

বোধহয় জানে না। আর জানবেই বা কি করে ? ওদের গায়ে হিংসার গন্ধ রয়েছে যে।

প্রথমপর্ব আগেই শেষ হয়েছিল। এবার শুরু হল অগ্নিযুগের দ্বিতীয়পর্ব।

তার আগে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো মীরা। অনেকদিন আগেকার কথা হলেও একাহিনী তোমার শুনতে ভাল লাগবে সন্দেহ নেই। কারণ এ কাহিনীর প্রধান নায়ক তোমাদের খুবই পরিচিত। তোমরা অনেকেই তাঁকে দেখেছ নিজের চোখে।

পদ্মা ও মেঘনার ভয়ঙ্কর রূপ তুমি কোনদিনও দেখেছ কি মীরা?

নিশ্চয়ই দেখোনি। কি করে দেখবে! রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অসংখ্য স্মৃতিতে ভরপুর সেই পদ্মা আর মেঘনা আজ আমাদের কাছে একেবারেই পর হয়ে গেছে। তার সেই অশান্ত রূপকে ভালবাসার কোন অধিকারই আজ আর আমাদের নেই।

ভরা বর্ষায় সে কি বিচিত্র রূপ পদ্মা ও মেঘনার। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙাগড়া মিছিলের।

মাঝে মাঝে ঝড় উঠে। দুরন্ত ঝড়।

উদ্দাম উচ্ছল পদ্মা ও মেঘনার সে কি তখন বিচিত্ররূপ। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দুবাহু আকাশে তুলে সে কি তার নাচের ঘটা। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সেই অপরূপ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব নয়।

কার সাধ্য তখন পদ্মা ও মেঘনা পাড়ি দেয়?

অসম্ভব। সেই পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ তো, মানুষ, এমনকি জাহাজ পর্য্যন্ত এ সময়ে পদ্মা ও মেঘনা পাড়ি দিতে ভয় পায়।

ভয় পায় না শুধু একজন। নাম তার—'কালীচরণ মাঝি।'

এমন জাত মাঝি সত্যই দুর্লভ। কি করে যে দুরন্ত পদ্মা ও মেঘনাকে বশ করতে হয়, তা সে ভালো করেই জানে।

সে অঞ্চলের অধিবাসীরাও তা জানে। জানে বলেই যখন-তখন তাদের কাছে ডাক পড়ে কালীচরণ মাঝির। বড্ড দরকার কালীচরণ ভাই। পারবে না তুমি আমাদের ওপারে পৌঁছে দিতে?

—পারুমনা ক্যান! সংগে সংগে কালীচরণ মাঝি প্রস্তুত, উইঠা আসেন নৌকায়।

—কিন্তু যে ভাবে আকাশ কালোকরে ঝড় উঠেছে······

—উঠতে ছান। আপনেগো বাপ্-মায়ের আশীর্বাদে কালীচরণের হাতে যতক্ষণ বৈঠা আছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকেন।

নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় উঠে বসে যাত্রীদল। কালীচরণ মাঝিকে বহু বছর ধরেই জানে। ভরা বর্ষায় পদ্মা বা মেঘনা পাড়ি দিতে সত্যই তার জুড়ি নেই

স্থানীয় দারোগাবাবুর অভিমতও তাই। হ্যাঁ, মাঝি বটে কালীচরণ। কতবার সে আমাকে নিয়ে পদ্মা ও মেঘনা পাড়ি দিয়েছে। ওর হাতে বৈঠা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত।

১৯১০ সাল।

বাংলার দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত।

ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন সবাই ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন। আরো কতজনকে যে এমনি করে প্রাণ দিতে হবে কে জানে?

একদিকে বাংলার দুর্জয়ী বিপ্লবী দল। অন্যদিকে বিভীষণের বংশধরগণ। বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। চাকরি জীবনে উন্নতি করতে হলে এর চাইতে সহজ পন্থা আর নেই।

বিপ্লবীরাও তখন মরীয়া। নির্মম ভাবে ওদের শেষ করে দিতে হবে। দেশবাসী হলেও বিশ্বাসঘাতকের কোন ক্ষমা নেই।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০ সাল।

স্থান-ঢাকার গোয়াল নগর। হেড কনেষ্টবল রতিলাল রায়ের সেদিন শেষ দিন।

সেই লোভ। সেই উচ্চাশা। জীবনে বড় হতে হবে। উন্নতি করতে হবে।

তারজন্য দরকার হলে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে হুজুরের কাছে যথাযথভাবে রিপোর্ট করতে হবে। তিনিই তো আসল মালিক। তিনি একটু সদয় হলে উন্নতি আর ঠেকায় কে?

কিন্তু সে সুযোগ আর রতিলালের হলনা এ জীবনে। তার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, রতিলাল শেষ।

কে এই আততায়ী?

কে সেদিন রতিলালকে এমন করে শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে?

কালীচরণ মাঝি। বছরের পর বছর চোখের সামনে দেখেও দারোগা সাহেব যাকে চিনতে পারেননি, সেই ছদ্মবেশী বিপ্লবী কালীচরণ মাঝি!

কালীচরণ মাঝি! কি আশ্চর্য্য! এযে তাজ্জব কথা। ঠিক আছে, ধরো এবার কালীচরণ মাঝিকে।

কিন্তু কোথায় কালীচরণ মাঝি! ততক্ষণে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন হেম ঘোষের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য রাজেন গুহের বাড়িতে। সেই রাজেন গুহ, যিনি পরবর্তীকালে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের বীর অধিনায়ক বিনয় বসুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের মেটিয়া বুরুজের বাড়িতে। উল্লেখযোগ্য যে, রাজেনবাবু তখন ঢাকাতেই থাকতেন। মেটিয়া বুরুজের ঠিকানায় এসেছিলেন আরো পরে।

কিন্তু এই কালীচরণ মাঝি কে? কি তার পরিচয়?

বিশ্বাস কর, আর নাই কর, তিনি কিন্তু আসলে অগ্নিযুগের এক

আশ্চর্য্য চরিত্র ছদ্মবেশী 'মহারাজ' (ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী) ছাড়া আর কেউ নন।

রতিলাল নিহত হয়েছিল ১৯১০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। তারপর কতযুগ কেটে গেছে, কিন্তু কেউ কোনদিন জানতে পারেনি যে, এ কাণ্ডের মহানায়ক কে?

জানা গেছে মাত্র কিছুদিন আগে। মহারাজ নিজেই সেদিন একথা স্বীকার করেছিলেন তার পুরানো সতীর্থদের কাছে।*

মহারাজের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে চলো আবার আমরা ফিরে যাই আগেকার সেই প্রসঙ্গে।

প্রথম পর্ব শেষ। দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সেনা-বিদ্রোহের প্রচেষ্টা এবং সর্বদলীয় মহান নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নিঃশেষ আত্ম বিসর্জনের মধ্যদিয়ে।

তারপরই কিছুদিন চুপচাপ। কারণ গান্ধীজী।

গান্ধীজীর অনুরোধ—তোমরা অস্ত্রসংবরণ কর। আমাকে কিছু

এই প্রসঙ্গ মহারাজ ১৮ই জুলাই 'সতীর্থ সংহতি' কর্তৃক আয়োজিত অভিনন্দন সভায় ভা[illegible] দেবার পর সভা অন্তে শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের সংগে একান্তে আলাপ করার কালে তাঁরই প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেন। ভূপেনবাবু ঘটনাটি আগেই জানতেন, তবু মহারাজের কাছ থেকে তিনি তার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

মহারাজ বলেন: 'হ্যাঁ, কাজটা আমিই করেছিলাম। তারপরই পূর্ব-সিদ্ধান্তমত চলে গিয়েছিলাম হেমচন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের কাছে। তাঁরই নির্দেশে আমি ঐ সেণ্টারে আশ্রয় নিয়েছিলাম।' এ্যাকশনের সময়ে সংগে আর কেউ ছিলেন কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ জানান,—ঠিক মনে নেই। খুব সম্ভব বীরেন চ্যাটার্জী ছিলেন। একটু ভেবে আবার বলেন: হ্যাঁ, বীরেন চ্যাটার্জীই ছিলেন। উল্লেখ যোগ্য যে, বীরেন চ্যাটার্জী অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতাদের অন্যতম।

সময় দাও। আমি তোমাদের অহিংস পন্থায় ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে স্বাধীনতা এনে দেবো গণআন্দোলনের মাধ্যমে।

কথা দিলেন বিপ্লবী নায়কগণ। বেশ তাই হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। তার মধ্যে যদি স্বাধীনতা এসে যায়তো ভাল কথা। নইলে তখন কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না।

গান্ধীজী ব্যর্থ হলেন। ফলে ১৯৩০ সন থেকে শুরু হল অগ্নিযুগের তৃতীয় পর্ব। তখনো সবার কাছে মুক্তিসংঘ হেম ঘোষের পার্টি বলেই পরিচিত। তারপরই হঠাৎ একদিন তার নতুন নামকরণ হল বি-ভি। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের গড়া বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সংক্ষিপ্ত নাম—বি-ভি।

এ নাম হেম ঘোষের পার্টির কারো দেয়া নয়, পুলিশর দেয়া। বার্জ হত্যার পর থেকেই পুলিশ এ দলকে বি-ভি নামে চিহ্নিত করে এসেছে বরাবর। এখন থেকে আমিও তাঁদের উল্লেখ করবো এই—'বি-ভি' নামেই।

প্রথম বিস্ফোরণ চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ। তারিখটা ছিল ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল। তারপর এখানে-ওখানে-সর্বত্র।

২৫শে আগস্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে আক্রান্ত হলেন বিপ্লব-আন্দোলনের পয়লা নম্বর শত্রু পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

অনুজা সেন ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন নিজের হাতে বোমা ফেটে গিয়ে। আর বন্দী দীনেশ মজুমদারকে দেয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

দুবছর বাদেই দীনেশ মজুমদার পালালেন মেদিনীপুর জেল থেকে। ২২শে মে তারিখে আবার তিনি ধরা পড়লেন খণ্ডযুদ্ধের পরে। এবার সাজা দেয়া হল—প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল ১৯৩৪ সনের ৯ই জুন।

আত্মোন্নতি সমিতির শক্তি তখন অনেকটা সীমিত। তাই এবার শুরু হল বি. ভি-র একক যাত্রা।

অবশ্য প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, মেজর সত্যগুপ্ত, প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ বছর কয়েক আগেই চলে এসেছিলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য—সংগঠনকে আরো জোরদার করে তোলা।

প্রথমেই ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল দলীয় মুখপাত্র 'বেণু', বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে যার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লেখাতো নয়, যেন জ্বলন্ত বুলেট। সামনে দুরন্ত চড়াই। সোজা দাঁড়াও সবাই। বল,—এদেশ আমাদের। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা স্বাধীনতা চাই।

কি রবীন্দ্রনাথ, কি শরৎচন্দ্র কেউ সেদিন দূরে থাকতে পারেননি 'বেণু'র কণ্ঠে এই নতুন গান শুনে। সবাই বেণুকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন তাঁদের বহুমূল্য লেখনী দিয়ে।

বিশেষ করে শরৎচন্দ্র। যে যাই বলুক না কেন, নিজের পছন্দ মত লেখাটি তাঁর বেণু পত্রিকায় দেয়া চাইই। অথচ বাংলা সাহিত্য জগতে তখন তাঁর বিরাট চাহিদা। সে চাহিদা মেটানোর মত সামর্থ্য আর যারই থাকনা কেন, বেণুর ছিল না।

কোন দুঃখ নেই তার জন্য! ক্ষোভও কিছুমাত্র নেই। কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে হেসে বলতেন—ওরা আমাকে কি করে দেবে বল? বরং আমারই তো উচিত ওদের কিছু দেয়া।

সে যেন আর একটা যুগ মীরা। আজো আবছা আবছা মনে পড়ে সেদিনের কথা। খুবই ছোট ছিলাম তখন আমরা। তবু কি আগ্রহ ভরেই না অপেক্ষা করতাম 'বেণু' পত্রিকার জন্য। পড়তে পড়তে রক্তে আগুন ধরে যেতো যেন।

আর মেজর সত্যগুপ্ত! সুভাষচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক সৃষ্টি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গঠনের ব্যাপারে মেজর সত্যগুপ্তের অবদান যে কি

ছিল, সে কাহিনী তো 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থের মাধ্যমে তোমাদের আগেই শুনিয়েছি মীরা।

এবার এ্যাকসন। না, মশা-মাছি মেরে হাত কালো করা চলবে না। মারিতো হাতী, লুঠিতো ভাণ্ডার। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঐ শক্ত মাথাগুলিকে চাই।

আর কার্যোদ্ধার না করে কাউকে ফিরে আসা চলবে না।

ব্যস, আর দেরী নয়। মরণপণ সঙ্কল্প বুকে নিয়ে এগিয়ে যাও। গো অন। এ্যাকসন! ডু অর ডাই।

দ্রাম! দ্রাম। দ্রাম! ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গনে (২৯শে আগষ্ট, ১৯৩০) প্রথমেই লুটিয়ে পড়লেন পুলিশের সর্বময় কর্তা মিঃ লোম্যান।

সেই সংগে গুরুতর ভাবে আহত হলেন ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ হডসন।

আততায়ী বি. ভি-র দুঃসাহসী তরুণ বিনয় বসু পলাতক। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ তার কোন হদিশ পেল না।

৮ই ডিসেম্বর আবার ইতিহাস সৃষ্টি করলেন সেই বিনয় বসু। সেদিন তিনি ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ ঢুকে প্রচণ্ড এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মেতে উঠলেন দুই সহযোগী বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে।

নিহত হলেন কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্ণেল সিমসন। আহত —আরো কয়েকজন।

অপর পক্ষে বাদল গুপ্ত ঘটনাস্থলেই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে। আহত বিনয় বসু দেহরক্ষা করলেন ঘটনার পাঁচদিন পরে—১৩ই ডিসেম্বর রাত্রে।

দীনেশ গুপ্তকে সাজা দেয়া হল—প্রাণদণ্ড।

ব্যস, এবার শুরু হল রক্ত দিয়ে হোলি খেলার পালা। সে খেলায় সবার উর্পরে মাথা তুলে দাঁড়াল মেদিনীপুর।

তার কারণও ছিল। এই দীনেশ গুপ্তই একদিন 'বি-ভি'র মেদিনীপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ঢাকা থেকে মেদিনীপুর গিয়ে।

ডাক শুনে সবার আগে সেদিন যাঁরা দীনেশের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা হলেন পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক প্রমুখ মেদিনীপুরের আদর্শ তরুণবৃন্দ। তারপর একে একে সবাই।

কি করে যে দীনেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে কাহিনী শ্রদ্ধেয় ফণী কুণ্ডু নিজেই তোমাদের শোনাবেন আরো কিছুক্ষণ বাদে।

সেই গুরু দীনেশ গুপ্ত। বিচারপতি গার্লিক তাকে সাজা দিলেন—প্রাণদণ্ড।

স্বভাবতঃই মেদিনীপুরের তরুণদল তখন মরীয়া, বেপরোয়া। তাদের সাফ কথা—এর বদলা আমরা নেবো। কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা মেদিনীপুরে থাকতে দেবো না। যেই আসুক না কেন, তাকেই আমরা খতম করে দেবো মেদিনীপুর থেকে। দীনেশদার পথই আমাদের পথ। সুতরাং প্রস্তুত হও সবাই। আর দেরী নয়। দীনেশদা যেন দেখে যেতে পারেন যে, আমরা—তার মন্ত্রশিষ্যরা এখনো মরে যাইনি।

প্রথমেই খতম করা হল মেদিনীপুরের দুর্দান্ত জেলাশাসক মিঃ পেডিকে। তারিখটা ছিল ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল।

আততায়ী বিমল দাসগুপ্ত এবং যতিজীবন ঘোষ পলাতক। কেউ তাদের কোন সন্ধান পেল না। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত দীনেশ গুপ্ত তখনো জীবিত।

কি করে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল সেই দুর্দান্ত জেলাশাসক পেডিকে?

এতবড় কাণ্ডের পর আততায়ী বিমল দাসগুপ্ত এবং যতিজীবন ঘোষ গেলেনই বা কোথায়?

কারা কারাই বা জড়িত ছিলেন সেদিনের সেই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের পেছনে ?

না আমি নই, স্বয়ং বিমল দাসগুপ্তই দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে আজ তোমাদের সে কাহিনী শোনাবেন আরো কিছুক্ষণ বাদে। ততক্ষণ ধৈর্য্য ধর।

২৭শে জুলাই আলিপুর কোর্টের মধ্যে ঢুকে খতম করা হল বিচারপতি গার্লিককে। এই গার্লিকই সেদিন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন দীনেশ গুপ্তকে।

এবার উল্টো তাকেই আবার প্রাণদণ্ড দিলেন বাংলাদেশের এক দামাল ছেলে কানাই ভট্টাচার্য। বিপ্লবী নায়ক সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের হাতে গড়া ছেলে—কানাই ভট্টাচার্য।

ঘটনাস্থলেই কানাই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন পটাশিয়াম সায়া-নাইড খেয়ে। পুলিশ কোনদিনই তার নাম-ঠিকানার হদিশ করতে পারেনি।

প্রথমে লোম্যান। তারপর একে একে খতম হলেন সিমসন, পেডি, গার্লিক প্রমুখ রাজকর্মচারীবৃন্দ। এবার কার পালা ?

কাকে এবার মুখ থুবড়ে পড়তে হবে বাংলাদেশের মাটিতে ?

কার জীবনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের হাতে ?

কে সেই লোক ?

তার আগেই পাল্টা আঘাত এলো ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ থেকে। তারিখটা ছিল ১৯৩১ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

সেদিন হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হল সন্তোষ কুমার মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে।

আহত হল আরো বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে গোবিন্দ দত্তর একটি হাত কেটে বাদ দিতে হল চিরদিনের মত।

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা দেশ। সব চাইতে বেশী ধিক্কার

জানালেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। নিরস্ত্র বন্দীদের এ ভাবে হত্যা করা কোন সভ্য দেশের রীতি নয়। তোমাদের শত ধিক্ !

উত্তরে শোনা গেল ইয়োরোপীয়ান বণিকসভার মুখপাত্রের সদম্ভ উক্তি ঃ

'If another European was murdered detenues should be shot.'

অর্থাৎ কোন শ্বেতাঙ্গ নিহত হলে আটক বন্দীদের হত্যা করা হবে !

বটে ! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলিভর্তি বিভলভার গর্জে উঠল ক্লাইভ স্ট্রিটের গিলেণ্ডার হাউসে—ড্রাম ! ড্রাম ! ড্রাম !

গুলি খেয়ে কে লুটিয়ে পড়ল অমন করে ! ভিলিয়ার্স। বণিক-সভার সভাপতি ভিলিয়ার্স। যিনি সেদিন সদম্ভে বলেছিলেন—'If another European was murdered detenues should be shot.'

আর আততায়ী ! কি নাম তার !

বিমল দাসগুপ্ত। সেই বিমল দাসগুপ্ত, যিনি মাত্র কিছুদিন আগে মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডিকে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন যতিজীবন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে।

বিচারে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হল বিমল দাসগুপ্তকে। আর ভিলিয়ার্স ! ভাঙা কোমর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিলেত।

ব্রিটিশ শাসনের মূলনীতি 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল।' অর্থাৎ—এক পক্ষকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে তাদের সাহায্যেই অন্যপক্ষকে সায়েস্তা করা।

ভিলিয়ার্স আহত। এই আহত দেহ নিয়েও বিলেত যাবার পথে তিনি ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল নীতির যে খেলাটি দেখিয়ে গিয়েছিলেন, তখনকার সময়কার সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি মীরা। এই বিবরণটি থেকেই তুমি সেদিনকার ব্রিটিশ নীতি সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পারবে আশা করি।

ইঙ্গ-মুসলীম চুক্তির জের

হিন্দু কর্মচারীগণ বরখাস্ত

"বোম্বাইয়ের অনেক ইউরোপীয় সওদাগরী অফিসের কর্মকর্তারা হিন্দুগণ কংগ্রেস সমর্থক বলিয়া তাঁহাদের সহিত অসহযোগ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এইসব অফিসে যে সব হিন্দু কর্মচারী কাজ করেন ও অন্যান্য যাঁহারা চাকুরী খুঁজিতে আসিয়া থাকেন, তাহাদের কাজে রাখা বা কাজ দেওয়া হইবে না বলিয়া নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে সেইস্থলে মুসলমানদের উপর যথেষ্ট সহানুভূতি ও অনুরাগ দেখান হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ, হিন্দু ব্যবসাদারদের সহিত অসহযোগ করিয়া মুসলমান বণিকগণের সহিত অতঃপর কারবার করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, ইংরেজ সওদাগর মহলে এইরূপ অসম্ভব মুসলীম প্রীতির কারণ এই যে, ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স বিলাত যাইবার অব্যবহিতকাল পূর্বে বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট মুসলমান বণিকগণের সহিত দেখা করিয়া গোপনে চুক্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই চুক্তি কি এখনও সাধারণে ব্যক্ত হয় নাই।" [আনন্দ বাজার : ১৬-৭-৩২]

খুশি হতে পারল না মেদিনীপুর। হবার কথাও নয়।

হিজলী বন্দীনিবাস তাদেরই এলাকায় অবস্থিত। সুতরাং পাল্টা মার দেবার দায়িত্ব যে তাদেরই।

ভিলিয়ার্সের মারটা ঠিক জুতসই হল না। বেটা গুলি খেয়েও ঠিক ফসকে গেল। সুতরাং আবার মার দিতে হবে। হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালনোর উপযুক্ত বদলা নিতে হবে।

কিন্তু কাকে ধরা যায় এবার ?

কে সেই লোক ?

বিচারপতি রক্সবার্গকে ধরলে কেমন হয় ?

না, রক্সবার্গ নয়।

পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেয়া হল, হিজলী ঘটনার তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশিত হবার পর। দেখা গেল—দোষ শাসক সম্প্রদায়ের নয়, রাজবন্দীদের। তারাই নাকি এই গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী।

কে সেই লোক যিনি তদন্ত কমিশনকে বিভ্রান্ত করেছিলেন কতগুলি মনগড়া যুক্তির অবতারণা করে ?

মেদিনীপুরের পরবর্তী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস।

সুতরাং ধরো এবার ডগলাসকে। ওকেই এবার সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্তের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে নিজের রক্ত দিয়ে।

সিদ্ধান্ত নিলেন বি-ভির এ্যাকসান স্কোয়াড। ডগলাসের ক্ষমা নেই। ওকে শেষ করতেই হবে।

শুরু হলো প্রস্তুতি পর্ব।

কাজটা মোটেই সহজ নয়। পুলিশ এখন আগেকার চাইতে অনেক বেশি সতর্ক। অনেক বেশি হুঁশিয়ার।

তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। যে করে হোক, ডগলাসকে একবার রিভলভারের পাল্লার মধ্যে পেতেই হবে।

বরাবরই বি. ভি-র মেদিনীপুর শাখা পরিচালিত হল মূল কেন্দ্র কলকাতা থেকে।

এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য প্রফুল্ল দত্ত তখন কলকাতায়। সাধারণত মেদিনীপুর শাখা পরিচালিত হত তাঁরই নির্দেশে। সহায়তা করতেন বিনয় সেনগুপ্ত।

যথাসময়ে একদিন প্রফুল্লবাবু তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন সহকর্মী বিনয় সেনগুপ্তকে।

তুমি একবার ঘুরে এস মেদিনীপুর থেকে। মোট তিনটি ছেলেকে আমি দেখে এসেছি। এদের মধ্যে দুটি ছেলে আমাদের চাই। বেশ ভাল করে দেখে-শুনে যাচাই করে নেবে। মনে রেখো, শুধু সাহসী হলেই চলবে না, বৈপ্লবিক চরিত্র থাকা চাই।

বৈপ্লবিক চরিত্র। বিপ্লববাদের মূল কথাই হল এই বৈপ্লবিক চরিত্র।

বিপ্লববাদ মুখের কথা নয়। খাঁটি বিপ্লবী হতে গেলে চাই বিপ্লববাদের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। চাই নিজ আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। চাই গভীর দেশাত্মবোধ। চাই ইস্পাত-কঠিন অনমনীয় চরিত্র, যা হাজার আঘাতেও এতটুকু টলবে না।

নইলে কি ভরসা ছিল সেদিন বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের! সম্বল বলতে তো কয়েকটা ভাঙা পিস্তল আর রিভলভার মাত্র।

তাছাড়া মহামান্য সরকার থেকে শুরু করে কি গান্ধীবাদী কংগ্রেস, কি সংবাদপত্র, সবাই তো সেদিন তাদের বিরুদ্ধতা করেছিল একযোগে।

তা সত্ত্বেও এই সম্বল নিয়ে অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাসে তাঁরা যে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে গেছেন, তার তুলনা কোথায় বলো?

সামান্য দু'একটি নজীর দিচ্ছি শোন:

আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে আই. বি. বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যা করার অপরাধে ১৯২৬ সনের ৯ই আগস্ট প্রমোদ চৌধুরী এবং অনন্তহরি মিত্র ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, সে তুমিও জানো।

কিন্তু অনন্তহরি কি সত্যি সেদিন জড়িত ছিলেন সেই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে?

না, ছিলেন না। তিনি তখন ছিলেন দোতলায়।

অনন্তহরি কি নিজেকে রক্ষার জন্য একবারও চেষ্টা করেছিলেন কোর্টের কাছে?

না, একটি বারের জন্যও না। বরং কে আগে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করবেন তাই নিয়ে সেদিন বুঝি আর প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না দুজনের মধ্যে।

কিন্তু কেন? নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানালেন না কোর্টের কাছে?

কারণ, সেই বৈপ্লবিক আদর্শ। দলীয় সিদ্ধান্ত—আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করবো না। ব্যস, আর কোন কথা নয়।

আদর্শের প্রতি বিশ্বাসহীনতা যে বিপ্লবীর কাছে অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিপ্লবী সংগঠনের শক্তি-উৎস বিশেষ করে রয়েছে দুটি জায়গায়। এক—মন্ত্রগুপ্তি, আর নিয়মানুবর্তিতা। বিপ্লববাদ বুঝতে হলে এরও তাৎপর্য্য তোমাকে বুঝতে হবে মীরা।

নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে মন্ত্রগুপ্তির কোন মূল্য থাকে না। সেক্ষেত্রে বিপ্লবকর্ম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য। খুশিমত যে যতই তার অপব্যাখ্যা করুক না কেন, মনে রেখো, এটাই হল বিপ্লব-বাদের আসল কথা।

সেদিন একজন লেখকের একটা লেখা পড়ছিলাম। তিনি নিজেও নাকি একজন প্রাক্তন বিপ্লবী। নিজের লেখনীর মধ্যে পাঠক-পাঠিকাদের সে কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বারবার।

তাঁর অভিমত:

"গুপ্ত সমিতির প্রতিটি সদস্য দলীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে পারে। গুপ্ত সমিতিতে এমন কেউ থাকতে পারে না, যিনি দাবী করতে পারেন যে, তার অজানিত কোন কাজ সমিতির কেউ কখনো করেননি। কিংবা যেখানে যে যাই করে থাকুক না কেন, সবই তাঁকে জানিয়ে করা হত। তাহলে সেই সংস্থা গুপ্ত সমিতির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।"

অতি অবাস্তব কথা। এই জ্ঞানগর্ভ থিয়োরী মানতে গেলে বিপ্লববাদের আসল রূপটাই যে পাল্‌টে যায়।

সেখানে না থাকে দলের কঠিন নিয়মানুবর্তিতা, না নিখুঁত Sense of Co-ordination। তা হলে তো একটি পার্টির মধ্যে বহু ইচ্ছা খুশি স্বাধীন গোষ্ঠির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বিপ্লবীদলতো ভোটপ্রার্থী Constitutional কোন দল নয়। সেখানে অটুট মিলিটারী ডিসিপ্লিন থাকবেই। কই, কোন সৈন্য-সংস্থায় লেখকের নির্দেশিত পন্থা-তো গৃহিত হতে দেখিনি। যখন সে পন্থা কোন সৈন্য বা সৈন্য-গোষ্ঠি গ্রহণ করে, তখন তাকে Mutiny ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

বিপ্লবী দলেও কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি নেতৃস্থানীয় কাউকে না জানিয়ে কোন Overt act করতো, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো বলেই ইতিহাসের উক্তি। এই মাতব্বরী বিপ্লবী-সংস্থায় অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি দিতে না পারাই বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির অযোগ্যতা। এসব আত্মঘাতী মাতব্বরীর অবকাশ সমূলে বিনষ্ট করাই গুপ্ত সমিতির যথার্থ যোগ্যতা। মিলিটারী ডিসিপ্লিন বা আয়রণ ডিসিপ্লিন যে দলের নেই, সে দলের লোক যাই হোন, সত্যিকারের বিপ্লবী নন।

যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। অনন্তহরি মিত্রের নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কথা তোমাকে একটু আগেই বলেছি। এবার শোন কালীপদ মুখার্জীর কথা।

এ ঘটনা ঘটেছিল ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে।

মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক কুখ্যাত কামাখ্যা সেনকে হত্যার অপরাধে কালীপদ মুখার্জী ফাঁসি-মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন, সে কথা এর আগেই তোমাকে আমি শুনেয়েছি 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থের মাধ্যমে।

অথচ কালীপদ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

দলের বিশ্বস্ত সদস্য হিসাবে কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত, কোন কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। তবু জেনেশুনেই সবকিছু দায়িত্ব তিনি টেনে নিয়েছিলেন নিজের উপর। দলের আর কাউকেই তিনি জড়াতে চাননি এ ব্যাপারে।

জেলে আবদ্ধ অন্যান্য সহকর্মীদের বিস্ময় কম ছিল না এই নিয়ে! এক ফাঁকে তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কেন তুমি এভাবে নিজের উপর সব দায়িত্ব টেনে নিলে কালীপদ ?

উত্তর দিয়েছিলে কালীপদ ঃ দল বেঁধে সবাই গিয়ে লাভ কি ? তার চাইতে একজনের যাওয়াই ভাল। আমি চলে যাচ্ছি তার জন্য দুঃখ নেই, তোমরা তো রইলে। তাতে অনেক বেশী কাজ হবে।

মীরা, এই হল বৈপ্লবিক চরিত্র। দেশের জন্য, দলের জন্য এভাবে নিজেকে বলি দিতে পারে শুধু তারাই, যারা এই বৈপ্লবিক চরিত্রের অধিকারী। এ জিনিস অত্যন্ত দুর্লভ।

'সত্যিকারের বিপ্লবী ভাঙে, কিন্তু মচকায় না।'

প্রমাণ, অগ্নিযুগের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় পাতায়, যার আদি আছে, অন্ত নেই।

যেমন ধরো, ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের মণীন্দ্র দত্ত। বি. ভি-র কর্মী। মোট পঁয়ত্রিশটি মামলা ত ন তার মাথার উপর ঝুলছে।

কিন্তু কোথায় মণীন্দ্র দত্ত। পুলিশ খুঁজে খুঁজে হয়রান, কিন্তু গত দুবছরের মধ্যে কোথাও তার কোন সন্ধান মেলেনি।

হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন মণীন্দ্র দত্ত। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

রাখা হল তাঁকে দক্ষিণ মৈশণ্ডি অঞ্চলের একটি গোপন আস্তানায়। বাড়ির কর্ত্রী একজন নার্স। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন ঘর-ছাড়া বিপ্লবীর পরম শুভার্থী বন্ধু।

দিদির মতই গভীর মমতাভরে মণীন্দ্রকে সেবা-যত্ন করতে লাগলেন মহিলাটি, কিন্তু অবস্থার কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না। গায়ে

প্রচণ্ড জ্বর। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। অসুখটা যে কি, ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

অবশেষে ডাকা হল দলীয় বন্ধু ডাঃ সত্যেন্দ্র দত্তকে।—কি করা যায় এখন বলুন ?

রোগী দেখেই শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল ডাঃ দত্তর মুখ।—এখুনি ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, নইলে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব। মণীন্দ্র যে পলাতক। মাথার উপর পঁয়ত্রিশটি মামলা—

—কি আর হবে! না হয় দশ বিশ বছরের জেল হবে, কিন্তু প্রাণটা তো বেঁচে যাবে। এখানে থাকলে সে আশা সুদূরপরাহত। আসল বসন্ত ভেতরে বসে গেছে। সুতরাং, Death or Surrender—এর একটাকে মেনে নিতেই হবে।

—Surrender! অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন মণীন্দ্র, নো—নেভার, বিপ্লবী মরতে জানে, কিন্তু সারেণ্ডার করতে জানে না—I prefer death। মৃত্যুই আমার কাম্য।

কাজেও তাই হল। সেই অনিবার্য্য মৃত্যু তিনি বরণ করে নিলেন হাসি মুখে, তবু কিছুতেই রাজী হলেন না নিজের আদর্শ থেকে তিল-মাত্র বিচ্যুত হতে।

পরের কাহিনী শ্রদ্ধেয় ভূপেন বাবুর লেখনী থেকেই তুমি শোন ঃ

"আরো একদিন বেঁচেছিলেন মণীন্দ্র দত্ত। পরম ধৈর্যে তিনি দৈহিক যন্ত্রণা ও ব্যথাজ্বালা ভোগ করে গেলেন, তবু বাঁচবার জন্যে আকুল হলেন না, হাসপাতালেও গেলেন না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মণীন্দ্রের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পরও যে তাঁর পরিচয় উদঘাটিত হতে পারে না। পলাতককে তাই অনামী হয়ে চিতায় আরোহণ করতে হবে। অথচ এই তরুণের বাবা মা ও ভাইবোন সবাই মাত্র দশ পনের মিনিটের পথ পেরিয়ে অবস্থান

করছেন, কিন্তু তাঁদের খবর দেওয়ার উপায় নেই। কারণ সেটা ১৯৪৪ সাল।

তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন তখনো ভাবছেন, ছেলে যেখানেই থাকুক, দুর্যোগ কেটে গেলেই আবার সে ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু মণীন্দ্র আর ফিরে এলেন না।

অনামী শহীদ! কিন্তু দুঃসহ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কত যন্ত্রণা ভোগ করে লোকান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁর পরিচয় অন্যে পরে তো দূরের কথা তাঁর সতীর্থরাও কি ভাল করে জেনেছেন? [সবার অলক্ষ্যে : (২য় পর্ব) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় : পৃঃ—২২১-২২২]

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে যায় আর একজনের কথা। তিনি হলেন বি. ভি-র নবজীবন ঘোষ।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানায় তিনি তখন ছিলেন অন্তরীণ বন্দী। কি অমানুষিক নির্যাতনই না অনুষ্ঠিত হয়েছিল বন্দী এই নবজীবন ঘোষের উপর।

অপরাধ, তিনি মেদিনীপুরের ছেলে। নিশ্চয়ই ওর পেটে বিপ্লবী মেদিনীপুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জমা হয়ে আছে। সুতরাং যে করে হোক, ওর মুখ খোলাতে হবে। নইলে—

সেই অমানুষিক নির্যাতনের ফলে একদিন শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল অন্তরীণ বন্দী নবজীবন ঘোষের জীবনে। ছোটভাই নির্মলজীবন আগেই প্রাণ দিয়েছিলেন ফাঁসি-মঞ্চে। এবার প্রাণ দিলেন তিনি নিজে।

কিন্তু পেরেছিল কি পুলিশ তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে?

না, পারেনি। কারণ, বিপ্লবী ভাঙে, কিন্তু কোনদিন মচকায় না। বিপ্লবীকে হত্যা করা বরং সহজ, কিন্তু তাকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এত সহজ নয়।

প্রমাণ—এই নবজীবন ঘোষ। তিলে তিলে তিনি নিঃশেষ করে

দিলেন নিজেকে, তবু এতটুকুও বিচ্যুত হলেন না নিজের আদর্শ থেকে।

অবশ্য সরকার পক্ষ তা স্বীকার করেনি কোনদিনও। তাদের বক্তব্য—নবজীবন ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন।

মৃত্যুর আগে তিনি একটি চিঠিও রেখে গেছেন তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে।

কই সে চিঠি! দাবী জানালেন পিতা যামিনীজীবন ঘোষ, আমার চিঠি আমাকে দেয়া হোক।

—না, ওসব দেয়া হবে না।

কিন্তু কেন? সত্যিই যদি নবজীবন আত্মহত্যা করে থাকেন, তাহলে সে চিঠি তার পিতাকে দেখাতে বাধা কোথায়?

—না, ওসব হবে টবে না।

ব্যস, হয়ে গেল। যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা। সুতরাং এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু সন্তোষ বেরা! কি হয়েছিল বি-ভির মেদিনীপুর শাখার আর একটি অনমনীয় তরুণ সন্তোষ বেরার বেলায়?

জলজ্যান্ত ছেলে। সন্দেহের অবকাশে একদিন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল থানার অভ্যন্তরে।

কিন্তু তারপর! না, তারপর আর কিছুই নেই। সব শেষ। ওটাও নাকি আত্মহত্যাই।

অবাক হবার কিছু নেই। বরং এইতো স্বাভাবিক। শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এইতো হয়ে আসছে বরাবর। এইতো বিপ্লবী জীবনের ভাগ্যলিপি।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ চিরদিনই দুর্গম ও ক্ষুরধার। এ পথে যাঁরা এসেছেন, তাদেরই সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। পদে পদেই তাঁরা হয়েছেন লাঞ্ছিত, অবমানিত, নির্যাতীত।

তা বলে কি সত্যিকার বিপ্লবী কোনদিন একটি ক্ষেত্রেও মাথা নুইয়েছেন তার প্রতিপক্ষের কাছে ?

কক্ষনো না।

প্রমাণ বিপ্লবী নায়ক পূর্ণ দাসের প্রিয় শিষ্য পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্র সিংহ। উল্লেখযোগ্য যে, বুড়ি বালামের তীরে অনুষ্ঠিত সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামে বাঘাযতীন ছাড়া আর বাকী যে ক'জন প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা সবাই ছিলেন বিপ্লবী নায়ক পূর্ণ দাসের মাদারীপুর গ্রুপের সদস্য। এঁরা হলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেন।

এঁদের মধ্যে চিত্তপ্রিয় প্রাণ দিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেই। বাকী দুজন ফাঁসি-মঞ্চে। এ প্রসঙ্গে মাদারীপুর গ্রুপের আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত চরমুগরিয়া এ্যাকশান মামলার বিচারে তিনিও একদিন প্রাণ দিয়েছিলেন ফাঁসির রজ্জুতে।

এই মাদারীপুর গ্রুপেরই পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্র সিংহের কথা এবার তোমাকে বলব, মীরা!

১৯২১ সনের শেষভাগের কথা। এঁরা সবাই তখন বন্দীজীবন যাপন করছিলেন ফরিদপুর জেলে।

কিন্তু কেন ?

কারণ গান্ধীজীর সেই অসহযোগ আন্দোলন, যার কথা সুরুতেই তোমাকে আমি বলেছি।

গান্ধীজীর একান্ত অনুরোধ : অস্ত্র সংবরণ করে তোমরাও আমার এই আন্দোলনে যোগ দাও। আমাকে একটা সুযোগ দাও। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দেবো।

কথা দিলেন বিপ্লবী নায়কবৃন্দ। সব পথই স্বাধীনতার পথ। যে পথেই আসুক না কেন, স্বাধীনতা স্বাধীনতাই। সত্যই যদি গান্ধীজীর

এই আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা এসে যায়তো মন্দ কি। দেখাই যাক না কিছুদিন।

তারপরই গান্ধীজীর নির্দ্দেশমত আইন অমান্য করে দলে দলে কারাবরণ। একমাত্র বাংলা দেশেই তার সংখ্যা দাঁড়াল আঠারো হাজার।

ছোট্ট জেল ফরিদপুর। কোন রকমে সেখানে পাঁচশত লোকের থাকা চলে। অথচ বন্দী বিপ্লবীদের সংখ্যাই তখন দাড়িয়েছে পাঁচশতের চাইতে বেশি। তাছাড়া সাড়ে তিনশত সাধারণ কয়েদী। তার উপর রোজই দলে দলে আসছে। আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, কাতারে কাতারে।

ফলে খাদ্য, বস্ত্র, স্নানের জল, সব কিছুই বাড়ন্ত। অথচ প্রতিকারেও কোন পথ নেই।

হাজার অসুবিধা। হাজার বিশৃঙ্খলা। তবু সব কিছু নিঃশব্দে মেনে নিলেন বিপ্লবীবৃন্দ। কারণ গান্ধীজীর কঠোর নির্দেশ, বাইরে আইন অমান্য করলেও জেলখানার আইনকানুন সবাইকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া ৩১শে ডিসেম্বরের আর খুব একটা বেশি দেরী নেই। এ সময়ে কিছু করে প্রতিপক্ষকে কোনরকম সুযোগ দেয়া ঠিক নয়।

সহ্য হল না জেল কর্তৃপক্ষের। একি তাজ্জব কথা। সাধারণ কয়েদীর দলতো বটেই, এমনকি সেপাইশান্ত্রীরা পর্যন্ত দেখছি ঐ স্বদেশীওয়ালাদের দস্তুরমত সমীহ করে কথা বলে। দেখলেই সেলাম করে। উঁহু, এ তো ভাল কথা নয়। সুতরাং, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা একটু করতেই হবে। নইলে ইজ্জত আর থাকবে না।

ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। অসম্মান ও অত্যাচারে অসহিষ্ণু বিপ্লবীগণ একদিন ঘোষণা করলেন: আজ থেকে জেল-আইন অনুসারে প্রতিটি বন্দীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আমাদের চাই। নইলে আজ সন্ধ্যায় কেউ আমরা সেলে ঢুকবো না।

বেকায়দায় পড়ে গেল জেল কর্তৃপক্ষ। তারপরই সুরু হল অমুনয়

বিনয়। লক্ষ্মী সোনারা, আজকের মত যে যার সেলে ঢুকে যাও। বড় সাহেবকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি কথা দিয়েছেন যে, কাল ভোরেই এখানে এসে এর একটা বিহিত করবেন। শুধু আজকের রাতটা কোনরকমে তোমরা লক্ষ্মী ছেলের মত পার করে দাও। দোহাই তোমাদের।

গান্ধীজীর নির্দেশ স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিলেন বিপ্লবী বৃন্দ। মাত্র তো একটা রাত। ঠিক আছে। দেখা যাক, কাল ওদের বড় সাহেব এসে কি বলেন।

বড় সাহেব হলেন শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি. পি. হগ্। যাকে বলে দুর্ধর্ষ আই. সি. এস অফিসার। শোনা যায় তার নামে নাকি বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

খবর শুনেই বড় সাহেব মিঃ হগ্ রাগে অগ্নিশর্মা। বড্ড বাড় বেড়েছে এই স্বদেশীওয়ালাগুলি। ওদের একটু সায়েস্তা করা দরকার। ঠিক আছে, আমিও মিঃ হগ্। অমন ঢের ঢের বিপ্লবী আমার দেখা আছে। ভোর হোক, তখন দেখা যাবে।

এদিকে ততক্ষণে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে জেলের অভ্যন্তরে। বড় সাহেবের নির্দেশমত সব ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। সেখানে এতটুকুও ত্রুটি থাকলে চলবে না।

যে কথা সেই কাজ। পরদিনই ভোর ঠিক ছটায় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বড় সাহেব এসে হাজির। কোথায় সেই স্বদেশী ওয়ালারা! ওদের সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে বল।

বিপ্লবী বন্দীরা তখন বিভ্রান্ত। সবে মাত্র সেলের তালা খোলা হয়েছে। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাইরে যাওয়া। তারমধ্যে একি উৎপাত!

ততক্ষণে সবাইকে ঠেলে লাইনে দাঁড় করাতে সুরু করে দিয়েছে উৎসাহী সেপাই বৃন্দ। ভাবটা এইযে, হুজুর রাজার প্রতিনিধি,

তিনি যা হুকুম করবেন, অনুগত ভৃত্যের দল তাই মানতে বাধ্য। সেখানে তাঁর ইচ্ছার উপর আর কোন কথাই খাটে না।

কক্ষনো না। তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন পঞ্চানন চক্রবর্তী, আমরা স্বাধীনতার সৈনিক। এ হুকুম আমরা মানিনে, মানবো না। বন্ধুগণ, সবাই তোমরা চলে এসো লাইন ছেড়ে।

ব্যস। কোথায় গেল লাইন, আর কোথায় রইল কি। দেখা গেল লাইন ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। একটি প্রাণীও না। বরং সবার কণ্ঠে শোনা গেল সেই একই ধ্বনি। আমরা এ হুকুম মানিনে, মানবো না।

তখনকার দিনে জেলখানায় একটা গ্লানিকর নিয়ম প্রচলিত ছিল, যাকে বলা হত—'সরকার সেলাম'।

কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী জেলে ঢুকলেই উচ্চকণ্ঠে জমাদার হাঁক দিত—'সরকার'। সার বেধে দাঁড়ানো কয়েদীদের তখন মাথা নুইয়ে বলতে হতো—'সেলাম'।

প্রভুত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের এই ছিল সেদিন নিত্যকার ব্যবস্থা।

প্রতি রবিবার সকালে আরো একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো, যা শুধু বীভৎসই নয়, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করাও শক্ত।

কাজটা হল, সর্বসমক্ষে একটা তেপায়ায় ঝুলানো বালির বস্তার গায়ে চাবুক মারার মহড়া প্রদর্শন।

এ কাজের জন্য ভাল খাওয়া দাওয়া এবং দণ্ডভোগের পূর্বেই খালাস দেবার সর্তে একটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির কয়েদীকে আগে থেকেই নির্বাচিত করা হতো। তারপরই প্রতিসপ্তাহে সুরু হতো সেই চাবুক মারার মহড়া। ভাবটা এই যে, ভাল চাওতো মুখ বুজে থাকো। বেশী গাঁই গুঁই করলে ঐ বালির বস্তার জায়গায় তোমাদেরই এনে ঝুলানো হবে। সুতরাং খুব সাবধান।

মানুষকে হীন করার কি পৈশাচিক কৌশল। আজকে কি হয়

জানিনে! তবে সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। যাক, পরের কাহিনী শোন।

লাইন ভেঙে যেতেই সেপাই শান্ত্রীর দল ছুটে গেল বড় সাহেবের কাছে। হুজুর লাইন টুট্ গিয়া।

হোয়াট! আহত জন্তুর কত ফুঁসে উঠলেন মিঃ হগ। এতবড় সাহস। আমার হুকুম অমান্য!

—হুজুর মা বাপ, আমাদের কোন দোষ নেই। ঐ পঞ্চাননবাবু সব কোইকো বিগড়্ দিয়া।

ইন্ধন জোগালেন ডেপুটি জেলার কাজী সাহেব। ওরা ঠিকই বলেছে হুজুর। যত নষ্টের শনি ঠাকুর হল ঐ পঞ্চানন চক্রবর্তী।

বটে! নিমেষে লালমুখ আরো লাল হয়ে উঠল বড় সাহেবের, আভি উন্‌লোককো সেল এ বন্ধ করো। জলদি। কুইক।

হুকুম পেয়ে সংগে সংগে দশ বারোজন সেপাই ছুটে এসে পঞ্চানন চক্রবর্তীকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেলে ঢুকিয়ে দিল জোর করে। থাকো এবার এই নির্জন সেলে বন্দী হয়ে। বুঝবে মজাটা।

এদিকে তখন শুরু হয়েছে অবিশ্বাস্য তাণ্ডব। প্রথমেই প্রায় ত্রিশ বত্রিশজন বন্দীকে জোর করে একপাশে ঠেলে নিয়ে লাইন করে বসানো হল। এরাই নাকি দলের রিং লীডার। সুতরাং এদের শিক্ষা দেয়া দরকার।

সেপাইদের আন্দোলন, অফিসারদের নর্তন-কুর্দন আর বড় সাহেবের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, সব মিলিয়ে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন।

বন্দীরা দিশেহারা। সামনেই সেই চাবুক মারার যূপকাষ্ঠ। ঘাতকও প্রস্তুত। মিঃ হগ, জেলার, সুবেদার, জমাদার, ডাক্তার, কমপাউণ্ডার ইত্যাদি প্রতিটি ব্যক্তিও হাজির। কিন্তু কেন! কি ব্যাপার!

ব্যাপার বোঝা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

লাইনের প্রথমেই ছিলেন সুরেন্দ্র সিংহ। এবার তাকে লক্ষ্য করেই শোনা গেল মিঃ হগ্ এর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার :

—সেলাম দেবে ?

—আমি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। বলতে চাইলেন সুরেন বাবু,—এভাবে আমাকে—

—ড্যাম্ ইওর শিক্ষক। সেলাম দেবে কিনা বলো ?

—নেতাদের সংগে পরামর্শ না করে—

—ড্যাম্ ইওর নেতা। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মিঃ হগ, নেতা বলতে কেউ নেই এখানে। সব ক্রিমিনাল। ওয়েল ডাক্তার—

—ইয়েস স্যার। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র চোখের পলকে পরীক্ষার কাজ সেরে নিয়ে রায় দিলেন জেলের ডাক্তার,—ফিট্ স্যার। কোয়ায়েট্ ফিট্—

—ভেরি গুড। এবার বাঁধো ওঁকে ঐ তেপায়ার সংগে। তারপর লাগাও গুনেগুনে পনেরো ঘা চাবুক।

গোটা জেলখানাটাতে মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধতা। একমাত্র হতভাগ্য বন্দীর আর্ত চীৎকার ছাড়া কারো মুখে তখন আর কোন কথা নেই। কিসের একটা অকথিত ব্যথায় প্রতিটি বন্দী যেন বোবা হয়ে গেছে। হাত পা বাঁধা এক অসহায় দুঃখের গুরুভার যেন তাদের বুকে একটা জগদ্দল পাথরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই হতভাগ্য বন্দীর। প্রতিটি কশাঘাতের সংগে সংগে সহকর্মীদের লক্ষ্য করে তবু মুখে সেই একই উৎসাহ বাক্য। তোমরা ভয় পেয়োনা। সাহস হারিয়ো না। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক। এতো আমাদের প্রাপ্য।

মিঃ হগ্এর নির্দেশে তারপরই নিয়ে আসা হল পঞ্চানন চক্রবর্তীকে। সব কিছুর মূলে রয়েছে এই অবাধ্য লোকটা। এই নাটের গুরুটিকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, ব্রিটিশ সিংহ সিংহই। পৃথিবীর যে কোন শক্তি তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য।

এদিকে পঞ্চানন চক্রবর্তী তখন অসাড়, নিস্পন্দ। এতক্ষণ সেলে আবদ্ধ ছিলেন বলে কিছুই তিনি জানতে পারেন নি। এবার একদিকে সুরেন সিংহের ক্ষতবিক্ষত দেহ, অন্যদিকে সহকর্মী বন্ধুদের অসহায় ভাব লক্ষ্য করে নিমেষেই তার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠলো জলের মত। একি অমানুষিক কাণ্ড! শেষে কিনা একজন অসহায় প্রধান শিক্ষকের উপর এই নৃশংস অত্যাচার!

দেখতে দেখতেই বিপ্লবী রক্তে আগুন ধরে গেল পঞ্চানন চক্রবর্তীর। এর প্রতিশোধ আমি নেবো। নাইবা রইল অস্ত্র, এই দাঁত দিয়ে কামড়েই আমি ঐ জানোয়ারটার কণ্ঠনালীটাকে ছিড়ে ফেলবো।

কিন্তু না। অপূর্ব সংযমবলে নিমেষেই আবার নিজেকে গুটিয়ে নিলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। সামনেই ৩১শে ডিসেম্বর। এখন এমন কিছুই করা ঠিক হবে না, যার ফলে গান্ধীজীর সেই-৩১শে ডিসেম্বরের প্রতিশ্রুতি বানচাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যাই হোক না কেন, ধৈর্য্য এসময়ে ধরতেই হবে।

—সেলাম দেবে কি না বল? নীরবতা ভেঙে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন মিঃ হগ্।

—কাকে! চোখে চোখ রেখে পালটা প্রশ্ন করলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী।

—কেন আমাকে? আমিই তো এখানে রাজ প্রতিনিধি—

—রাজ প্রতিনিধি! ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ঝলসে উঠলেন্ পঞ্চানন চক্রবর্তী, রাজাই মানিনে, তা আবার রাজ প্রতিনিধি! তাও কিনা আবার তোমার মত লোককে!

বটে! আহত পশুর মত গর্জে উঠলেন মিঃ হগ্, বাঁধো ইস্কো। জোরসে লাগাও চাবুক। জলদি। দেখি সেলাম আদায় হয় কিনা! বুক চিতিয়ে নিজেই সেই তেপায়ার কাছে এগিয়ে গেলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। নাও, মারো আমাকে। আমি প্রস্তুত। নিরস্ত্র বন্দীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করাব ক্ষমতা তোমার আছে, সে কথা

একশোবার স্বীকার করি। তা বলে আমার আদর্শ থেকে আমাকে বিচ্যুত করবে, এমন ক্ষমতা তোমার নিশ্চয়ই নেই। দেখা যাক, কি করে তুমি আমার কাছ থেকে সেলাম আদায় কর।

—ঠিক আছে! রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠলেন মিঃ হগ, বোঝা যাবে এবার কার কত মুরদ।

প্রথমেই পঞ্চানন চক্রবর্তীর পায়ে লোহার বেড়ী এঁটে দেয়া হল শক্ত করে। তারপর হাত দুটি উর্দ্ধবাহু করে এঁটে দেয়া হল তেপায়ার হাতকড়ার সংগে। কোমরে শক্ত করে বাঁধা হল চামড়ার বেল্ট। নগ্ন উরুদ্বয়ে লাগানো হল একটুকরো বিষ-প্রতিষেধক ন্যাকড়া। ব্যস! উদ্যোগ আয়োজন এখানেই শেষ।

ওদিকে শক্ত চাবুক নিয়ে ঘাতক তখন প্রস্তুত। শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

রেডি! হাঁক দিলেন মিঃ হগ।

স্যার! কুণ্ঠিত ভাবে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন জেলার সাহেব, ডাক্তারী পরীক্ষাটা……

—ফিট্ স্যার। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পঞ্চানন চক্রবর্তীর পিঠে স্টেথিসকোপ্ ছুঁইয়েই রায় দিলেন জেলের ডাক্তার, সেন্ট পারসেণ্ট ফিট।

মীরা, জেলখানার অভ্যন্তরে এই চাবুক মারাটা যে কি জিনিষ, তা বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

এদিকে অসহায় বন্দী তখন তেপায়ায় বাঁধা অবস্থায় দণ্ডায়মান। শক্ত বাঁধুনী। কোনরকমেই তার নড় চড় করার উপায় নেই।

অন্যদিকে তেলমাখানো কড়া চাবুক নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে দণ্ডায়মান সেই ঘাতক।

ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সে চাবুক উঁচিয়ে দৌড় সুরু করবে ক্রিকেটের ফাষ্ট বোলারের মত। তারপর যথাস্থানে এসেই সেই ভয়ঙ্কর চাবুক তীক্ষ্ণ শিশ দেবার মত শব্দ করে আছড়ে পড়বে

হতভাগ্য বন্দীর উরুদ্বয়ের উপর। সংগে সংগে ক্ষতস্থান থেকে এখানে ওখানে রক্ত-মাংস ছিটকে পড়বে অজস্রধারায়।

পরক্ষণেই সেই নরদানব আবার ফিরে যাবে সেই আগেকার জায়গায়। আবার সেখান থেকে দৌড় সুরু করবে সেই একই ভাবে। আবার সেই তীক্ষ্ণ চাবুক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে বন্দীর উন্মুক্ত দেহের উপর। এমনি করে বারবার।

বড়জোর দুতিন ঘা। তারপরই বন্দী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নির্মম সেই কশাঘাতের ফলে। তাতেও রেহাই নেই। ডাক্তার তৈরীই থাকে। জ্ঞান ফিরে এলেই আবার সেই শক্ত চাবুকের ঘা।

এবারও দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। বন্দী প্রস্তুত। উদ্যোগ আয়োজনেরও কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এখন সুরু করলেই হয়।

—বলো, আমাকে সেলাম দেবে কিনা? শেষ বারের মত প্রশ্ন করলেন মিঃ হগ।

—না, দেবো না।

—বটে! ঠিক আছে। গো অন্।

বলতে না বলতেই সপাং করে শক্ত চাবুক এসে আছড়ে পড়ল পঞ্চানন চক্রবর্তীর উন্মুক্ত দেহের উপর। সাহেব নিজেই তার সংখ্যাগুলি গুনতে লাগলেন—ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-ফাইভ-···

—এখনো বলো যে, সেলাম দেবে কিনা?

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। অসংখ্য মাংসের টুকরো ছিট্‌কে পড়েছে এখানে ওখানে। তবু কোন কথা নয়। কোন যন্ত্রণাসূচক শব্দও নয়।

—জবাব দেবে না! রাগে বুঝি অন্ধ হয়ে গেলেন মিঃ হগ, অলরাইট। গো অন্। সিক্স-সেভেন-এইট্-নাইন-টেন-······

—এই লাষ্ট চান্স। এখনো বল যে, সেলাম দেবে কি না?

পঞ্চানন চক্রবর্তী নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দেহ অবশ, কিন্তু মন তখনো জাগ্রত। না, কোন কথা নয়। কোন রকম নতি স্বীকার নয়।

ক্ষমতা লোভী এই নরপিশাচটা দেখুক যে, সত্যিকার বিপ্লবী ভাঙে, কিন্তু কোনদিনও মচকায় না।

—বটে! এখনো এত তেজ। ঠিক আছে, জোরসে লাগাও আউর পাঁচ চাবুক। ইলেভেন্‌-টুয়েলভ্‌-থারটিন-ফোরটিন-ফিফ্‌টিন। রাইট্‌লী সার্ভড্‌। আশাকরি চিরদিন মনে থাকবে। আভি ছোড় দো—

কিন্তু একি! চলে যেতে যেতে সহসা কি দেখে থমকে দাড়ালেন মিঃ হগ। কে! কে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্ত্তে?

আশ্চর্য্য! সত্যই আশ্চর্য্য! তেপায়া থেকে ছাড়া পেয়ে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে কিনা সেই পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কেন? কি বলতে চায় মাদারীপুরের এই বেপরোয়া লোকটা?

—দাড়াও মিঃ হগ। যাবার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

থমকে দাড়ালেন মিঃ হগ। ছুচোখে তার সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—তুমি তো সেলাম চেয়েছিলে। সেলামটা আদায় করতে পেরেছ কি? 'Have you got your salam'?

স্তম্ভিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ হগ। তারপরই তিনি সবার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন গট্‌গট্‌ করে।

দুর্দান্ত শাসক বলে এতকাল নিজের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছিল, আজ বাংলাদেশের এক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী তার সেই দম্ভকে লোকসমক্ষে খান্‌খান্‌ করে ভেঙে দিয়েছে। এ লজ্জা, এ পরাজয় তিনি রাখবেন কোথায়?

ফল হল সুদূরপ্রসারী। খবর শুনে সে কি অলোড়ন সেদিন সারা দেশ জুড়ে। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। দেখালে বটে আজ বাংলার বিপ্লবী সমাজ।

অভিনন্দন পাঠালেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। দেশবন্ধুকে তিনি লিখলেন :—কে এই পঞ্চানন চক্রবর্তী আমি জানিনে। আমি শুধু তাকে একবার দেখতে চাই। কলকাতায় তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে আমি সুখী হবো।

পরবর্তী কালে তাই তিনি করেছিলেন দেশবন্ধুর মাধ্যমে। মুক্ত-কণ্ঠে সেদিন তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন পঞ্চানন চক্রবর্তীকে।

আর গান্ধীজী!

ফরিদপুর জেলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি যা লিখেছিলেন তার ভাবার্থ হল :

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সময়ে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশ ছিল,—প্রতিটি পথচারীকে লাঠির উপরে রক্ষিত একটা টুপিকে সেলাম দিতে দিতে হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে হবে। পাঞ্জাবের অধিবাসীগণ বিনা প্রতিবাদে তাই মেনে নিয়েছিল। এই প্রথম বাংলা-দেশ দেখাল যে, কি করে প্রতিবাদ জানাতে হয়।

মীরা, এই ছিল সেদিন বাংলাদেশের বিপ্লবী চরিত্র, যে চরিত্র সম্বন্ধে পরবর্তীকালে চার্লস টেগার্টের মত বিপ্লবীদের পয়লা নম্বর শত্রু ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছিলেন :

"The grandest revolutionaries I have met is the Bengal Brand. In sheer excellence of character they surpass their counterparts in any other country."

অর্থাৎ,—এ পর্য্যন্ত আমি যে সব বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে বাংলার বিপ্লবীরাই 'গ্রাণ্ডেষ্ট' (সর্বাধিক ভাব-সুন্দর)। চরিত্রবলে পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে তাঁরা অগ্রগণ্য। [ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় পৃঃ ৪৪২]

আর আজ! যবনিকার অন্তরালে সেদিনের সব কিছুই আজ বিগত, বিস্মৃত, মৃত।

অথচ আজো সেই দেশ আছে। সেই মানুষ আছে। নেই শুধু

সেই আদর্শবাদ। যে আদর্শবাদের জন্য বাংলাদেশ একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সবার উপরে।

পঞ্চানন চক্রবর্তী আজো বেঁচে আছেন সবার অগোচরে। সবার অলক্ষ্যে।

আজকের মানুষ কেউ তাকে চেনে না। চেনবার কথাও নেই। দিশাহীন রাজনীতির কুটিল চক্রান্ত আমাদের চরিত্র হনন করে একেবারেই আমাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই একদিন যাঁরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সব চাইতে দুঃসাহসী সৈনিক, আজ তাঁরা আমাদের কাছে অপরিচিত। আজ আর তাঁদের কোন দামই নেই আজকের এই স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষের কাছে।

সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যাঁরা চলে গেছেন, তাদের কথাই বা কতটুকু জানি আমরা?

কতটুকু জানি, ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেনের নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কথা?

জানি কি কিছু?

তা বলে এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না মীরা। বিপ্লব কোনদিনও থামতে জানে না। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম।

তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা-যতীন, সূর্য সেনের মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দল আবার ফিরে আসবেন, আমাদের দেশে। আসবেন ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। বিপ্লবের ধর্মই যে তাই।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর রূপ অনেকখানি পাল্টে গেছে। তাই এই নতুন পৃথিবীতে এবার তারা আসবেন নতুন নামে, নতুন রূপে, নতুন পরিচয়ে।

হয়তো সেদিনও স্বার্থান্বেষী নীতিবাগীশের দল তাদের 'ভ্রান্ত যুবক' বলে উপহাস করবে। সেই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রগুলি

তাদের 'অপরিণামদর্শী' আখ্যা দিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে।

তা বলে তোমরা যেন তাদের সেই অপপ্রচারে আর বিভ্রান্ত হয়ো না। মনে রেখো যে, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ বা সূর্য সেনের মত মানুষগুলি সংসারে শুধু দিতেই আসেন, নিতে নয়।

যাক, আবার সেই মেদিনীপুরের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

যথাসময়ে মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসে বিনয় সেনগুপ্ত তার রিপোর্ট পেশ করলেন এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য প্রফুল্ল দত্তের কাছে।—দুটি ছেলেকে আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ উপযুক্ত ছেলে।

অবশ্য মেদিনীপুর শাখায় ছেলের অভাব নেই।

কর্মী হিসেবে পবিমল রায়, হরিপদ ভৌমিক, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, ফণী কুণ্ডু, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, ক্ষিতি সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন্দ্র দত্ত, যতিজীবন ঘোষ, বিমল দাসগুপ্ত, ফণীন্দ্র দাস, প্রভাংশু পাল, কামাখ্যা ঘোষ, নরেন্দ্র দাস, শচীন কানুনগো, কামাখ্যা ঘোষ (২) নন্দদুলাল সিংহ, নির্মল রায়, অশোক রায়, ভূপতি মণ্ডল, শান্তিরঞ্জন সেন, সনাতন রায়, বীরেন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, শৈলেন কুণ্ডু, সরোজ কানুনগো, অমর সেন, শীতাংশু পাল, মণি চৌধুরী, পাঁচকৌড়ী সেতুয়া, অশোক দাশ, সুশীল রায়, অমর সিংহ, হিমাংশু মিত্র, প্রমথ মুখার্জী, ভববন্ধু পাঁজা, বিমলজীবন ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণলাল ব্যানার্জী, অনিল রায়, অমলেন্দু দাসগুপ্ত, নবজীবন ঘোষ, সুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শান্তিরঞ্জন ঘোষ, বিনোদবিহারী সেন, বিমল অধিকারী, ভূপাল পাণ্ডা, সন্তোষ বেরা প্রমুখ সবাই ওরা উপযুক্ত

ছেলে। তবু ভগলাস নিধনের কাজে এ দুজনকে পাঠালেই ভাল হবে।

বেশ.তাই হবে। কথাটা মেনে নিলেন প্রফুল্ল দত্ত,—আমাদের ফাইনাল সিদ্ধান্তের কথা মেদিনীপুর শাখায় জানিয়ে দাও। আর ওদের দুজনকে এ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হতে বল।

ওরা দুজন হলেন প্রভাংশু পাল, আর প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। সেই প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, যার আবক্ষ মূর্তির পাশে এখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা দুজনে।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর প্রভাংশু পালের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনিয়েই আমি আমার এবারের কাহিনীর উপর ইতি টানবো মীরা।

আগেই বলে রাখছি যে, এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই সবকিছু তথ্যই আমাকে নিতে হয়েছে বি-ভিন্ন অন্যতম প্রধান নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং এ অভিযানের অন্যতম নায়ক প্রভাংশু পালের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দেয়া স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের একটি গ্রন্থ থেকে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা যা বলে গেছেন, আমি তা নিজের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র।

মেদিনীপুরের ছেলে হলেও প্রভাংশু থাকতেন তখন কলকাতায়।

পিতা আশুতোষ পাল ছিলেন উত্তর কলকাতার একজন নামী চিকিৎসক। স্বভাবতই প্রভাংশুকেও তখন থাকতে হতো বলরাম দে স্ট্রিটের বাড়িতে।

প্রদ্যোৎ বরাবরই থাকতেন মেদিনীপুরে। অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। বছর দুই আগে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন মেদিনীপুর হিন্দু স্কুল থেকে। ডাক নাম কচি।

সত্যই কচি। সবে মাত্র সতেরো বছর পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথাবার্তা। এমন চোখ জুড়ানো ছেলে সত্যিই বিরল।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর রবীন্দ্র-কাব্যপ্রীতি। এ বয়সে এমন রবীন্দ্রভক্ত সত্যই বড় একটা দেখা যায় না। ঠিক যেন দীনেশ গুপ্তেরই প্রতিচ্ছবি।

ইতিমধ্যে বিনয়বাবুর আহ্বানে কয়েকবারই কলকাতায় আসতে হয়েছে প্রদ্যোৎকে।

অবশ্য ছেলে হিসেবে সত্যিই ওর তুলনা নেই, তবু বয়েসের দিক থেকে একেবারেই 'কচি'। কাঁচা লোহাকে আগুনে পোড় খাইয়ে শক্ত ইস্পাতে পরিণত করা দরকার।

—শোন প্রদ্যোৎ, তুমি দেখেছ যে, ঢাকাতে লোম্যান মার্ডার থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমাদের একটি গুলিও কোনক্ষেত্রে মিস্ হয় নি। এবার সে দায়িত্ব নিতে হবে তোমাদেরই। পারবে না তুমি দলের সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে?

—পারবো।

—ডগলাসকে খতম না করে কেউ ফিরে আসবে না বল?

—না, আসবো না।

—আর যদি ধরা পড়? পারবে তখন তুমি শেষ পর্যন্ত দলীয় মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতে?

—পারবো।

—কোনরকম নির্যাতনই হয়তো বাদ যাবে না। ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হওয়াও মোটেই বিচিত্র নয়। তার জন্য তুমি প্রস্তুত?

—হ্যাঁ, প্রস্তুত।

—বেশ তাই হোক। তুমি প্রস্তুত হও। আমরা আশা করবো যে, তোমার দ্বারা আমাদের দলীয় মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হবে না। এবার তুমি ফিরে যাও মেদিনীপুরে। কখন কি করতে হবে, সবকিছু নির্দেশ তুমি যথাসময়েই পেয়ে যাবে।

ওদিকে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে মেদিনীপুর শাখার বিশ্বস্ত

মহলে। চূড়ান্ত নির্দেশ এসে গেছে কলকাতার কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে। আর দেরী নয়। যত শীগ্‌গীর সম্ভব ডগলাসকে খতম করতে হবে।'

পরামর্শের জন্য প্রদ্যোৎ, প্রভাংশু এবং অপর সতীর্থ ফণী দাস ইত্যাদি সবাই একদিন মিলিত হলেন শচীন কানুনগোর বাড়িতে। শচীন দলের বিশ্বস্ত সদস্য। সুতরাং অসুবিধে কিছু নেই।

কি করা যায় এখন ?

কিভাবে এগুনো যায় ?

সবচাইতে বড় সমস্যা—ডগলাস। পয়লা নম্বরের ভীরু লোকটা। কিছুতেই তিনি তার অফিসে যেতে রাজী নন। যা কিছু কাজকর্ম করেন, সবই প্রহরীবেষ্টিত বাংলোতে বসে। প্রতিমুহূর্তে ভয়, এই বুঝি পেডির মত ওঁর জীবনেরও শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল মেদিনীপুরের মাটিতে।

এ অবস্থায় ওকে রিভলবারের পাল্লার মধ্যে পাবার উপায় কি ?

হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। সে উপায় হল জেলাবোর্ডের অধিবেশন।

এ অধিবেশন বসে প্রতিমাসে একবার করে। বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে সেদিন তাকে আসতেই হবে। এটা প্রায় বাধ্যতামূলক।

অবশ্য অসুবিধে সেখানেও কম নয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা মোট তেত্রিশ। তার মধ্যে পাঁচজনই হল মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। সবাই তারা সশস্ত্র।

তদুপরি সঙ্গে থাকবে রিভলভারধারী বডিগার্ড। ডগলাসের নিজের সঙ্গেও যে বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এতগুলি সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ডগলাসকে খতম করাটা সম্ভব হবে কি ?

হবে। হতেই হবে। কাজটা শক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু এছাড়া

ডগলাসকে পাল্লার মধ্যে পাবার কোন রাস্তা খোলা নেই। সুতরাং ঝুঁকি এক্ষেত্রে নিতেই হবে। প্রদ্যোৎ, প্রভাংশু—তোমরা প্রস্তুত ?

—হ্যাঁ, প্রস্তুত।

—বেশ, তাহলে সেই কথাই রইল। মনে রেখো, আমাদের এ্যাকসন হবে সামনের এই মার্চ মাসেই। তোমরা প্রস্তুত থেকো।

অপর পক্ষও প্রস্তুত। শীগ্‌গিরই যে কিছু একটা ঘটবে, সে সম্বন্ধে ভাবা নিঃসন্দেহ।

সন্দেহের কারণ কতগুলি উত্তেজনামূলক ইস্তাহার। কে বা কারা এগুলি শহরে প্রচার করেছে জানা যায়নি, তবে বেশ বোঝা যায় যে, তলে তলে কিছু একটার প্রস্তুতি চলছে সুতরাং সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইস্তাহারগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি মীরা। প্রথম ইস্তাহার :

"খবরদার! তোমরা বিদেশীদের ফন্দিতে প্রতারিত হয়ো না। যদি বাঁচতে চাও, তাহলে বিদেশীদের কোনরূপ সাহায্য করোনা।

এতদিন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এখন বুঝতে পেরেছ, তোমরা কি করে তাদের গোলাম হয়ে পড়েছ। তারা তোমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করছে, তোমাদের ধনসম্পত্তি লুট করছে, মনুষ্যত্ব থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছে, শুধু বাকী রেখেছে তোমাদের জীবনটুকু। তাও নিতে আর বেশী বিলম্ব হবে না। তাই আমরা বলি,—তোমরা বিলিতি জিনিস ক্রয়ের অভ্যাস ত্যাগ কর।"

দ্বিতীয় ইস্তাহারটিতে কি লেখা ছিল শোন :

"ভারত আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁচেছে। এটা ভাল করে বোঝ। যদি তোমার ধমনীতে এখনো রক্তস্রোত প্রবাহিত

হয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থা উপলব্ধি করে সেইরূপ কাজে প্রবৃত্ত হও।”

পরের ইস্তাহারটি প্রচার করা হয়েছিল স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের উদ্দেশ্য :

“…*শৃঙ্খলিতা রোরুদ্যমানা মাতৃভূমির প্রতি কি তোমাদের কোন* কর্তব্য নাই? প্রত্যহ অন্ততঃ দশমিনিট এই মরণোন্মুখ জাতির শোচনীয় দুরবস্থার কথা চিন্তা করে দেখ।

…দীনেশ গুপ্ত তোমাদের মত একজন ছাত্র ছিলেন। তোমরা কি কারাগৃহের সামান্য ক্লেশ সহ্য করতে পারবে না?

হিজলীর কথা স্মরণ কর!…

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাসও একজন বাঙালী ছিলেন। আত্মাহুতি না দিলে জাতির মুক্তিলাভ হয় না। অনাহারে বা রোগের আক্রমণে মরার চেয়ে কর্তব্য করে মানুষের মত মর।”

সর্বশেষ ইস্তাহারটি প্রচার করা হয়েছিল বাংলার লালকোর্তা সমিতির ছদ্মনামে। সেখানে বলা হয়েছিল :

“এই শপথ নিয়ে কাজে লাগতে হবে যে, আমরা সারা বাংলার কৃষকদের জাগিয়ে তুলব। আর ইংরেজের অহঙ্কার চূর্ণ করে দেব। বার বার বল—

‘আমরা অত্যাচারীর রক্ত চাই।’

দলে দলে এগিয়ে এস, হাজারে হাজারে ঝাঁপিয়ে পড় অত্যাচারী ইংরেজের ঘাড়ের উপর। নিশ্চিহ্ন করে দাও তাদের ভারতবর্ষের বুক থেকে।”

শুধু ইস্তাহার নয়, সেই সঙ্গে ভীতি প্রদর্শনমূলক বেনামী চিঠি। সে চিঠি পাঠানো হয়েছিল স্বয়ং ডগলাসের কাছেই।

চিঠিটা আমি তুলে দিচ্ছি এখানে।

“ডগলাস,

আমরা জানতে চাই যে, ঝাড়গ্রাম মহকুমার সর্দিয়া মাণিকপাড়া

ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে স্থানীয় পুলিশ দারোগা কর্তৃক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপর যে দমননীতি ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা তোমার আদেশের ফলে হয়েছে কি না।

এ ধরনের সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের কাজ আরম্ভ করার আগে নিশ্চিন্ত হতে চাই যে, এসব কাজ তোমার আদেশে বা তোমার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না।

আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখব এবং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখব যে, এই দমননীতি বন্ধ করার জন্য তুমি কোন সন্তোষজনক আদেশ দিয়েছ কি না! অন্যথায় তোমার এই দমননীতির বিরুদ্ধে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য অগ্রসর হবো এবং এটা স্মরণ রেখো যে, এর পরিণাম অত্যন্ত সাংঘাতিক হবে।"

স্বভাবতঃই এসব কারণে সরকার পক্ষও তখন রীতিমত প্রস্তুত। ইতিপূর্বে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে প্রাণ হারাতে হয়েছে বিপ্লবীদের হাতে। আর কোনমতেই ওদের সে সুযোগ দিলে চলবে না। দরকার হলে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে মেদিনীপুরের মাটি থেকে। সরকারী নির্দেশ তাই।

অপর পক্ষে প্রদ্যোৎ এবং প্রভাংশুও প্রস্তুত। প্রাণ যায় যাক, তবু ডগলাসের শির চাইই। কিছুতেই ওকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না মেদিনীপুর থেকে। ভু স্মর ডাই।

১৯৩২ সন। মার্চ মাস।

ভেতরে জেলাবোর্ডের অধিবশন শুরু হয়েছে। সভাপতি জেলা-শাসক ডগলাস।

বাইরে প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎ।

বার বার তারা চেষ্টা করতে লাগলেন বোর্ড ভবনের ভেতরে

যেতে, কিন্তু সব বৃথা। সর্বত্র কড়া পাহারা, তাদের নজর এড়িয়ে কোনরকমেই সদর ফটক অতিক্রম করার উপায় নেই। অথচ ভেতরে যেতে না পেলে ডগলাসকে পাল্লার মধ্যে পাওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত ফটকের একটা পাল্লা খানিকটা টেনে দিয়ে আশে পাশেই অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রভাংশু এবং প্রদ্যোৎ। পাল্লা অর্ধমুক্ত থাকার দরুন ভেতর থেকে আসা ডগলাসের গাড়ির গতি এখানে মন্থর হতে বাধ্য।

সেই সুযোগে দুজনে গুলি চালাবেন দুদিক থেকে। রিভালবার তৈরীই আছে।

কিছুতেই কিছু হল না। ছুটে এল একজন সশস্ত্র প্রহরী। পাল্লা খুলে দিয়ে কি ভেবে সেখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল শেষ পর্যন্ত।

হতাশ হয়ে ফিরে এলেন প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎ। দুজনের মনেই তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

এতদিনের এত চেষ্টা, এত আয়োজন, তা কোন কাজেই এল না। এ দুঃখ যে জীবনেও যাবার নয়।

সবচাইতে বেশি মর্মাহত হলেন প্রদ্যোৎ। হাতের মুঠোয় পেয়েও ডগলাসকে কিছু করা গেল না, দুর্ভাগ্য। সত্যিই দুর্ভাগ্য। এ দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই।

'Failure is the pillar of success.'

আবার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎ।

আজকের এই ব্যর্থতাই বড় কথা নয়। এই ব্যর্থতার শিক্ষা নিয়েই আবার আমরা এগিয়ে যাব দ্বিগুণ উদ্যমে। কিছুতেই হার মানব না। আমাদের প্রতিজ্ঞা, 'ডগলাসকে আমরা খতম করবই।' কোনমতেই তাকে ফিরে যেতে দেবো না মেদিনীপুর থেকে।

প্রভাংশু ফিরে গেলেন কলকাতায়। ঠিক হল—পরবর্তী

অধিবেশনের দিনক্ষণ ঠিক হলেই আবার তিনি ফিরে আসবেন মেদিনীপুরে।

খবর চলে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। ৩০শে এপ্রিল অধিবেশন বসবে। চলে এসো।

কথামত আগের দিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর ফিরে এলেন প্রভাংশু। সঙ্গে নিয়ে এলেন দলনেতাদের কাছ থেকে ৩৮ ক্যালিবারের একটা রিভলভার এবং বেশ কিছু বুলেট।

স্টেশন থেকে সোজা সতীর্থ ফণী দাসের বাড়ি। জিনিসগুলো রাখো। কাল ভোরে আসব। প্রদ্যোৎকেও সঙ্গে নিয়ে আসব। তখনই কথা হবে।

সেখান থেকে মাতুল অমল বসুর বাড়ি। একটু বিশেষ দরকারে আসতে হল মামা। তু'তিনদিন থাকতে হবে।

না না, তেমন কোন জরুরী কাজ নয়। অনেকদিন মামা-মামীর দেখা নেই, তাই একটু পদধূলি নিতে আসা আর কি।

কথামত পরদিন ভোরে প্রদ্যোৎ সহ আবার ফণী দাসের বাড়ি। কথাবার্তা যা কিছু বলার, এইবার শেষ করে ফেলতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র-গুলিও ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। আর সময় নেই।

কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশ,—এবার কার্যোদ্ধার করতেই হবে। সম্ভব না হলে বিকল্প হিসেবে তুদিনের মধ্যেই (২রা মে) বিচারপতি রক্সবার্গকে খতম করতে হবে। তুজনের একজনকে চাইই। তবে ফার্স্ট চান্স ডগলাস।

প্রদ্যোৎ এবং প্রভাংশুর ইচ্ছাও তাই। ফার্স্ট চান্স—ডগলাস। ডগলাসের ক্ষমা নেই। সুতরাং আজকের এই সুযোগ কোনরকমেই হারালে চলবে না।

ঠিক হল তুজনকেই সামান্য মেক-আপ নিতে হবে।

প্রভাংশু অত্যন্ত বলিষ্ঠদেহী। তাই দেহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে

তাকে একটি গোঁফ ধারণ করতে হবে যাত্রাদলের সেনাপতিদের মত।

প্রদ্যোতের চোখে থাকবে কাঁচহীন একটি চশমার ফ্রেম। সিঁথি কাটতে হবে মাথার অন্যদিকে। দুজনেরই পায়ে থাকবে ক্যানভাসের জুতো। আর পকেটে থাকবে সামান্য কিছু টাকা। আর থাকবে ছোট একটি চিরকুট। তাতে লেখা থাকবে—'হিজলীর অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ'।

প্রভাংশুর সঙ্গে থাকবে কলকাতা থেকে আনা সেই পাঁচঘরা ছোট রিভলভারটি। প্রদ্যোৎকে দেওয়া হবে বড় একটি রিভলভার।

প্রদ্যোতের রিভলভারের বুলেটগুলিকে বেশ ভাল করে গরম করে নেওয়া হল বালি-ভর্তি কড়াইতে চাপিয়ে। যদিও আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না, তবু অনেকদিনের অব্যবহৃত বুলেট। সুতরাং সাবধানতা ভাল।

ঠিক হল, যাত্রা শুরু হবে বিকেল চারটেয়। নির্দিষ্ট সময়ে দুজনেই এসে মিলিত হবেন ডায়মণ্ড ফুটবল গ্রাউণ্ডে। সেখান থেকে জেলাবোর্ড ভবনের দিকে।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সন।

সেই জেলাবোর্ড ভবন। ভেতরে পাত্রমিত্র সহ সেই ডগলাস। এখানে ওখানে ছড়ানো সেই সদাসতর্ক সশস্ত্র প্রহরীর দল। কার সাধ্য তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বোর্ড ভবনের ধারে কাছে এগোয়।

সব কিছু দেখেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন প্রদ্যোৎ আর প্রভাংশু।

বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আজ ডগলাসের শেষ দিন। যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন

কিছুতেই আজ তাকে ফিরে যেতে দেয়া হবে না প্রাণ নিয়ে। হিজলী বন্দীদের রক্তের ঋণ আজ তাকে নিজের রক্ত দিয়েই পরিশোধ করতে হবে।

প্রথমেই বাধা পেলেন উত্তর-পূর্ব কোণের ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে। সামনেই দাঁড়িয়ে জনৈক সশস্ত্র প্রহরী। ইধার ক্যায়া মাংতা আপ্‌লোক?

—আমরা! বোঝাতে চেষ্টা করলেন প্রভাংশু, আমরা বোর্ডের কর্মচারী হ্যায়। মিটিংএর সময় জরুরী কাগজপত্র আমাদের দেখাতে হবে সাহেবকে। গেট ছোড় দিজিয়ে।

—হুকুম নেহি। প্রহরী অটল, অনড়।

এবার উত্তর-পশ্চিম কোণের ফটক। সেখানেও সেই একই ব্যাপার। হুকুম নেই।

দুজনেই তখন দৃঢ়সঙ্কল্প।

না, এভাবে বার বার ব্যর্থতাকে মেনে নিলে চলবে না। কিন্তু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

কিন্তু কি করা যায়?

বোর্ড ভবনের চারপাশে তারের বেড়া।

কোন রকমে এই বেড়াটা টপকে ভেতরে যাওয়া যায় না?

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তাছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই চোখের সামনে। কার্যোদ্ধার করতে হলে কিছুটা ঝুঁকি এক্ষেত্রে নিতেই হবে।

নিমেষে মনস্থির করে নিলেন ওরা দুজন।

ডগলাস এখন সভাকক্ষে। স্বভাবতঃই প্রহরীর দল এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওদের প্রস্তুত হবার আগেই বেড়া টপকে ছুটে গিয়ে ডগলাসকে খতম করে ফেলতে হবে।

তারপর যা হবার হবে, সে সব পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

কাজেও তাই করা হল। বিকেল তখন পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অধিবেশন শেষ হতে আর বেশী বাকী নেই। শেষ হয়ে এল বলে।

সহসা কি দেখে চমকে উঠল সভাকক্ষের উত্তর দিকে গল্পগুজবে মত্ত প্রহরীর দল।

ওরা কারা?

এখানে এলই বা কি করে?

কেন ওরা ঝড়ের মত ছুটে যাচ্ছে হুজুরের দিকে?

কি মতলব ওদের?

কোন কিছু বুঝে উঠবার আগেই গর্জে উঠল গুলি-ভরা রিভল্ভার —ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গেই ডগলাস হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লেন টেবিলের উপর। তারপর গড়িয়ে একেবারে মাটিতে।

একটা বিমূঢ় নিশ্চল পরিস্থিতি। উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী বিস্মিত, নির্বাক। যেন ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে তারা।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই শুরু হল হৈ-চৈ, চীৎকার আর চেঁচামেচি। পাকড়ো! পাকড়ো! আসামী ভাগতা হ্যায়। ঐ যে পালাচ্ছে! শিগগীর ধরো ওদের।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রথমেই ছুটে গেল বসির আলি, মহম্মদ আলি, প্রমুখ রক্ষীদল।

পেছনে পেছনে তমলুকের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জর্জ, ঝাড়গ্রামের নৃপেন মিত্র, কাঁথির মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এন. সেন, ডগলাসের চাপরাশী কেনারাম মুর্মু প্রমুখ রাজভক্তের দল। গুলিও ছুঁড়লেন কয়েক রাউণ্ড, কিন্তু তা কোন কাজেই এল না।

সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন প্রভাংশু। তাড়াতাড়ি রিভলভারে গুলি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আগুন ছড়ালেন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

তারপরই এক সময়ে টুক করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন 'অমর লজ' এর পাশের রাস্তা ধরে। গুলি খাবার ভয়ে কেউ আর তাকে অনুসরণ করতে সাহস পেল না।

প্রদ্যোৎ ছুটে চললেন সদর রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে। পেছনে সেই খয়ের খাঁ এবং দেহরক্ষীর দল।

ব্যাবধান কমে আসছে ক্রমশঃ! আর বেশি বাকী নেই। অনেকটা কাছে এসে পড়েছে অনুসরণকারীর দল। আরো কাছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ট্রিগারে চাপ দিলেন প্রদ্যোৎ, কিন্তু একি! গুলি তো ছুটছে না! আবার চাপ দিলেন, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই।

সেই যান্ত্রিক গোলযোগ। দেখা গেল, এ পর্যন্ত একটি বুলেটও কার্যকরী হয়নি প্রদ্যোতের রিভলভার থেকে। যা কিছু করেছে; সবই প্রভাংশুর রিভলভার।

বেগতিক দেখে অধুনালুপ্ত 'সায়েন্স লজ' নামে এক পোড়োবাড়ির দক্ষিণ দিকের কামরায় ঢুকে পড়লেন প্রদ্যোৎ। হাতে সেই অকেজো রিভলভার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল অনুসরণকারীর দল। আসামী এখানেই রয়েছে। হুঁশিয়ার ভাই সব। কোন রকমেই যেন এ ফসকে যেতে না পারে।

পোড়ো বাড়ি। দরজা-জানালা বলতে কিছুই নেই। যেন একটা ভূতুড়ে বাড়ি আর কি!

এবার সেই খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল রক্ষীবাহিনীর মহম্মদ আলি। দেখা যাক, ও পক্ষ থেকে কোন রকম সাড়া আসে কিনা।

রিভলভারে নতুন গুলি ভরে নিয়ে আচমকা ঘর থেকে বেরিয়ে

এলেন প্রদ্যোৎ, তারপরই তিনি ছুটতে শুরু করে দিলেন উত্তর দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠল পেছন থেকে—পাকড়ো। পাকড়ো।

আবার ট্রিগারে চাপ দিলেন প্রদ্যোৎ, কিন্তু সব বৃথা। সেই যান্ত্রিক গোলযোগ। ফলে এবারও কোন বুলেট কার্যকরী হল না তার রিভলভার থেকে।

বেগতিক দেখে আবার প্রদ্যোৎ ছুটে চললেন উত্তর দিকে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তার অনেক আগেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন মুখে শক্ত একটা ইটের আঘাত পেয়ে।

সেই সুযোগে রক্ষীবাহিনীর বসির আলি তার ভূলুণ্ঠিত দেহটার উপর চেপে বসল শক্ত করে। তারপরই সবাই মিলে উন্মত্ত প্রহার। সিংহশাবক ফাঁদে পড়েছে। সুতরাং বীরত্ব প্রকাশ করতে এখন আর কোন অসুবিধে নেই।

কিন্তু কেন এমন হল ?

কেন কার্য্যকালে প্রদ্যোতের রিভলভারে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল ?

তবে কি এই মারণাস্ত্রটা আগে কোনরকম টেষ্ট করে দেখা হয়নি ?

সব কিছুর উত্তর তুমি পাবে প্রদ্যোতের সতীর্থ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার দাসের বক্তব্য থেকে, ডগলাস হত্যার ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কথা পরে আসছে।

প্রভাংশু সরে পড়লেন অমর লজ-এর পাশের রাস্তা ধরে।

রাস্তায় গোঁফজোড়া বিসর্জন দিয়ে সোজা মাতুল অমল বসুর বাড়িতে। তারপরই দিব্যি গল্পগুজবে মেতে উঠলেন বাড়ির সবার সংগে। যেন কিছুই জানেন না আর কি!

ততক্ষণে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে গোটা শহর জুড়ে।

পেডির পরে দ্বিতীয় জেলা মেজিস্ট্রেট ডগলাসও নিহত।

আততায়ীদের একজন ধরা পড়েছেন ঘটনার পরেই। অন্যজন পলাতক। এ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদিও সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককেই।

কেন যে ভাগ্নে বাবাজীর হঠাৎ এত মাতুলভক্তি, তা অনুমান করে নিতে এবার আর মোটেই দেরী হল না অমলবাবুর। সংগে সংগেই তিনি ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন প্রভাংশুকে সামনে রেখে।

আজ রাত হয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক নয়। যে করে হোক, কালই তুমি কলকাতায় ফিরে যাবে মেদিনীপুর ছেড়ে। সংগে মেয়েছেলে থাকলে সন্দেহ কম হবে, তাই ভগ্নি নীলিমাকে নিয়ে যাবে সংগে করে। স্টেশনে যাবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে দেব আমি। কলকাতায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, আজই তুমি কলকাতায় ফিরে গেছ। তারপর এদিকে যা করার আমিই করবো।

নিঝুম, নিশুতি রাত্রি। গোটা অঞ্চলটা ঘুমিয়ে পড়েছে নিঝুম ঘুমের অতলান্তে।

শুধু ঘুম নেই প্রভাংশুর চোখে। আসে রাশি রাশি ভাবনা।

ভাবনা প্রদ্যোতের জন্য। ডগলাস নিহত। রাত সাড়ে ন'টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

কিন্তু প্রদ্যোৎ। সংগী প্রদ্যোৎ ধরা পড়েছে। অদৃষ্টে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে, কে জানে।

ডগলাস নিহত হলেন ১৯৩২ সনের ৩০শে এপ্রিল। পরদিনই সে খবর ফলাও করে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

মেদিনীপুরের জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস নিহত

"৩০শে এপ্রিল, অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের জেলা মেজিস্ট্রেট

ডগলাস যখন জেলাবোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, তখন প্রায় তিনবার তাঁহাকে লক্ষ্য করে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রকাশ যে তাঁহার বাহুতে ও বক্ষস্থলে গুলী লাগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ডগলাস সাহেব রাত্রি ৯৷৹টায় মারা গিয়াছেন।

এই সম্পর্কে রিভলভার সহ একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [আনন্দবাজার : ১-৫-৩২]”

পরিকল্পনা মত পরদিন দুপুরেই প্রভাংশু সেই নির্দিষ্ট ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসলেন ভগ্নি নীলিমাকে নিয়ে। লক্ষ্য—রেলস্টেশন।

যেতে যেতে সহসা কি দেখে দৃষ্টিটা থমকে গেল প্রভাংশুর।

সামনেই কবরখানা। পাশাপাশি দুটি কবর। একটি পেডির অন্যটি ডগলাসের।

এখানেই কি শেষ? নাকি আরো দু একটি কবর উঠবে ওখানে?

কে জানে! একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই এ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম।

এদিকে তখন ঝড় বয়ে চলেছে মেদিনীপুরের উপর দিয়ে। একজন ধরা পড়েছে। আর একজন এখনো পলাতক। যে করে হোক, তাকে ধরা চাই-ই।

প্রথমেই ডেকে নিয়ে আসা হল নারায়ণ গড় থানার ডাকসাইটে দারোগা রাহাৎবক্স চৌধুরীকে।

যাকে বলে গুণী লোক। কি করে পেটের কথা টেনে বের করতে হয়, সে সম্বন্ধে স্থানীয় ভুপেনদারোগার চাইতেও তিনি রীতিমত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কায়দা-কানুনও জানেন যথেষ্ট। সুতরাং ডাকো তাকে।

অত্যন্ত আনন্দের সংগে এগিয়ে এলেন রাহাৎবক্স চৌধুরী সাহেব।

কোথায় অসামী। নিয়ে এস তাকে। তারপর দেখা যাক যে কার কত হিম্মৎ।

শুরু হল অমানুষিক নির্যাতন। বল, কে ছিল তোমার সঙ্গে। কি নাম তার? কোথায় পেলে এই রিভলবার?

প্রদ্যোৎ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। না, কোন কথা নয়। এ সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই তাঁর। বিপ্লবী জীবনে অত্যাচার বা নির্যাতন নতুন কোন কথা নয়। এ তো জানা কথাই।

ছিঃ প্রদ্যোৎ! রসিকতা করে বললেন স্থানীয় ভূপেনদারোগা, শেষে কিনা তুমি এমন একটা রিভলবার নিয়ে এলে, যা কাজের বেলায় কোন সাড়াই দিল না।

স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে এবার জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ:

Irony of fate Bhupen Babu! Had my revolver spoken out I would not have been here in this condition, the story would have been otherwise.

[অদৃষ্টের পরিহাস ভূপনবাবু। আমার রিভলবার সাড়া দিলে আপনি কি আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পেতেন? ইতিহাস তাহলে অন্যরকম হতো।]

বটে! ক্ষিপ্তের মত জ্বলে উঠলেন ভূপেনদারোগা, তোমাকে— আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলাবো। আর তোমার ভাইদের সারা জন্মের মত কয়েদ করে রাখবো। তখন বুঝবে যে ভূপেনদারোগা কি জিনিস।

রাহাৎবক্স চৌধুরীর নির্দেশে এবার ধরে নিয়ে আসা হল প্রদ্যোতের সতীর্থ ফণী দাসকে। প্রদ্যোৎকে রাখা হল খানিকটা দূরে, যাতে প্রতিটি ঘটনা সে দেখতে পায়।

শুরু হল চিরাচরিত চাল। তুমিই তো রিভলবার দিয়েছ

প্রদ্যোৎকে। প্রদ্যোৎ নিজেই স্বীকার করেছে সেকথা। ঐ তো বসে আছে ওখানে। তাকিয়ে দেখো। সুতরাং, যা জানো বলে ফেল।

—আমার কিছু জানা নেই এ সম্বন্ধে।

—বটে! প্রদ্যোৎ তাহলে তোমার নামে মিছে কথা বলেছে বলতে চাও? নাঃ! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। বেশ, রাহাৎবক্স দারোগা যে কি চীজ, এবার তাহলে দেখে নাও।

প্রথমেই বড় বড় কয়েকটা শূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া হল ফণী দাসের নখের মধ্যে।

সেই সঙ্গে হাতের ডাণ্ডা দিয়ে অমানুষিক প্রহার। সবশেষে হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতন।

ভাল চাও তো এখনো খুলে বল সব কথা। নইলে রাহাৎবক্সের হাতে যখন একবার পড়েছ, তখন আর দিনের আলো চোখে দেখতে হবে না। কি, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও!

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে শঙ্কায় কালো হয়ে উঠল রাহাৎ-বক্সের মুখ, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে। তাছাড়া মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে গল গল করে। মরে গেল নাকি লোকটা! এ্যাঁ!

নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন রাহাৎবক্স। শীগগির বড়সাহেব ইভান্সকে খবর দাও। যা হোক্ একটা ব্যবস্থা—

খবর পেয়ে তক্ষুণি ছুটে এলেন পুলিসের বড়সাহেব মিঃ ইভান্স। কি ব্যাপার?

—আমার কোন দোষ নেই হুজুর। প্রায় কেঁদে ফেললেন রাহাৎবক্স, আমাকে জব্দ করার জন্য লোকটা ইচ্ছা করেই টেঁসে গেছে। বিশ্বাস করুন।

—আই সি। ঘাবড়াও মৎ। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। জলদি সিভিল সার্জন মিঃ ড্রামণ্ড কো বোলাও।

কোথায় সিভিল সার্জন। তিনি তখন রয়েছেন গোদাপিয়াশাল নামক একটা জায়গায়। মেদিনীপুর থেকে তার দূরত্ব সাত মাইল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন মিঃ ইভান্স। সার্জনকে নিয়ে ফিরে এলেন রাত বারোটায়।

কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। থানা হাজতে বিচারাধীন বন্দী খুন হলে আইনের হাত এড়ানো মুশকিল।

সুতরাং, সিভিল সার্জনই এখন একমাত্র ভরসা।

কেস্ সিরিয়াস। দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন সিভিল সার্জন মিঃ ড্রামণ্ড,—চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেও বা যেতে পারে। তবে সর্বাগ্রে এর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেওয়া দরকার।

বোধহয় রাহাৎবক্সের মুখ চেয়েই শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গেলেন ফণী দাস। দীর্ঘদিন বাদে, ২০শে মে তারিখে তাঁকে হাজির করা হল বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

এবার আসল মূর্তি ধারণ করলেন ফণী দাস।

ইওর অনার, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার কাছে। সন্দেহ ক্রমে কাউকে গ্রেপ্তার করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করার কোন অধিকার পুলিশের আছে কি?

এই কি সুসভ্য ব্রিটিশের বিচারের নমুনা?

তাদের নিজের দেশেও কি বন্দীদের উপর এমনি অমানুষিক নির্যাতন করা হয়ে থাকে?

—লিখিত ভাবে আবেদন কর।

তাই করলেন ফণী দাস। সব কিছুই তিনি বিস্তৃতভাবে লিখে জানালেন হাকিমের খাস কামরায় বসে। ভুপেন দারোগা, রাহাৎবক্স, কারো কাহিনীই সেখানে বাদ গেল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়্যালিউল ইসলাম।

তদন্ত হল চমৎকার। সবই একতরফা। সেখানে রাহাৎবক্স যা জবানবন্দী দিলেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য।

"হুজুর মা বাপ। আসামীর অভিযোগ একেবারে ডাহা মিথ্যা। বিশেষ কাজের জন্য আমি মেদিনীপুর এসেছিলাম। ভূপেনবাবু আমার অনেকদিনের বন্ধুলোক। তারই অনুরোধে তাকে আমি একটু সাহায্য করতে এসেছিলাম আর কি।

আসামী ফণী দাস আমার ছেলের বয়েসী। তাই ছেলের মত করেই তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আমি তাকে বোঝাচ্ছিলাম যে—কেন তোমরা ভুল পথে চলছ বাবা। তোমরা হলে দেশের ভবিষ্যৎ। এ সব না করে যাতে সবার মুখ উজ্জ্বল করতে পার—

আরে বাসরে বাস। কি বলবো হুজুর। বলতে না বলতেই ছেলেটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সমানে কিল ঘুসি চালাতে লাগল আমার উপর। সেপাইরা বাধা দিলে। তখন ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে সামান্য একটু লেগে থাকবে হয়তো, নইলে বাপের বয়েসী হয়ে আমি তার গায়ে হাত তুলবো, এটা কি একটা কথার কথা হল হুজুর। আপনিই ভেবে দেখুন না!"

ব্যাস, মামলা ডিসমিস। ১৩ই জুন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে, অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। আসামী ফণী দাসের উপর কোন রকম অত্যাচার করা হয়নি।

হাকিমের বক্তব্য,—অভিযোগ মিথ্যে। কিন্তু কি লেখা রয়েছে সিভিল সার্জেনের রিপোর্টে। কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে।

"৩রা মে মধ্যরাত্রিতে আমি থানায় গিয়েছিলাম। পুলিশের নির্দেশে সাত মাইল দূরবর্তী গোদাপিয়াশাল থেকে আসতে হয়েছিল আমাকে।

থানা গারদে গিয়ে আসামী ফণী দাসকে আমি দেখতে গেলাম। দেখলাম, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং প্রচুর ঘাম দিচ্ছে। তার দেহে চারটে জখম দেখি। যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে

—প্রায় আধঘণ্টা কাল আমি সেখানে ছিলাম। পরদিন ভোরে আবার দেখতে গিয়াছিলাম। ঐ দিনই সন্ধ্যায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল এবং তাকে অক্সিজেন দিতে হয়েছিল। ঐ দিন সকালে তার দেহে আরো চারটে জখম দেখা যায়। ঐদিন সন্ধ্যায় আমি যখন পরীক্ষা করি, তখন তার দেহে বহু জখমের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালে আসার পরে ক্রমশঃ তার অজ্ঞানতার ভাবটা কেটে যায়।"

কিছুতেই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এ রায় মেনে নিতে পারলেন না ফণী দাস। তাই রায়ের বিরুদ্ধে এবার তিনি আপীল করলেন মেদিনীপুরের দায়রা জজের আদালতে।

ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ অভিযোগ মিথ্যে!

তবু হার মানলেন না ফণী দাস। দেখা যাক, হাইকোর্ট কি বলে।

এবার কাজ হল। হাইকোর্ট থেকে বলা হল—ম্যাজিস্ট্রেটের এ আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী। ভূপেন দারোগা বা রাহাৎবক্স যা বলেছে, তা মিথ্যে। সুতরাং পূর্ব রায় বাতিল। আবার নতুন করে বিচার করতে হবে এ অভিযোগের।

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন মেদিনীপুরের শাসক সম্প্রদায়।

না! মান-মর্যাদা আর রইল না দেখছি। একবার হাইকোর্টের কাছ থেকে ধমক খেতে হয়েছে। আবার বিচার করতে গেলে তখন যে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না, তা কে বলতে পারে?

তার চাইতে ঐ নাছোড়বান্দা ছেলেটাকে ডাকো। ওর অভিভাবক এবং আইনজ্ঞদেরও সঙ্গে আসতে বল। ওদের বুঝিয়ে বল যে, আসামী তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিক, পরিবর্তে আমরাও ওকে ডগলাস মার্ডার কেস থেকে রেহাই দেবো।

আইনজ্ঞদের পরামর্শমত শেষপর্যন্ত তাই মেনে নিলেন ফণী দাস।

এ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। নইলে ডগলাস মার্ডারের কেস থেকে রেহাই পাওয়া সত্যই তার পক্ষে কষ্টকর ছিল।

ভেতরে ভেতরে পুলিশী তৎপরতা তখন সমানেই চলেছে।

পেডি হত্যার এখনো পর্যন্ত কোন কিনারা করা সম্ভব হয়নি। তার উপর ডগলাস।

সেখানেও একজন পলাতক। কে সেই লোক? কে হতে পারে? আসামী প্রদ্যোতের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের মধ্যে কেউ এখন আর বাইরে নেই বলতে গেলে। ফণী দাস, নরেন দাস, ক্ষিতি সেনগুপ্ত, যতিজীবন ঘোষ, কামাখ্যা ঘোষ, ভাই শর্বরী ভট্টাচার্য, সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দেহের বশে। আর কে বাকী আছে যার দ্বারা একাজ সম্ভব হতে পারে? আছে কি কেউ?

হ্যাঁ, একজন বাকী আছে।

প্রভাংশু পাল। যদিও থাকে সে কলকাতায়, তবু তার দ্বারা একাজ সম্ভব হলেও বা হতে পারে। সুতরাং ধর এবার প্রভাংশুকে।

দিন কয়েক বাদেই কলকাতায় প্রভাংশুর খোঁজে একদিন পুলিশ এসে হাজির। চলো এবার আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরের হেড কোয়ার্টার্স ইলিসিয়াম রো-তে।

—যাচ্ছি বাপু, কিন্তু অপরাধটা কি বলবে তো?

উত্তর পাওয়া গেল ইলিসিয়াম রো-তে। দিনকয়েক আগে তুমি মেদিনীপুর গিয়েছিলে কেন বলো?

—বোনকে আনতে। নীলিমা ওখানেই ছিল কিনা।

—ফিরেছ কবে?

—ত্রিশ তারিখে—বেলা তিনটের গাড়িতে।

—আমি যদি বলি যে, ওদিন তুমি মেদিনীপুরেই ছিলে?

—কি যে বলেন স্যার। বিশ্বাস না হয় তো মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না।

সমর্থন জানালেন মামা অমল বসু। জম্বু (প্রভাংশুর ডাক-নাম) তো সেদিন তিনটের গাড়িতেই চলে এসেছে নীলিমাকে নিয়ে।

একই কথা শোনা গেল মামার পরিচিত সেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানটির মুখে। হ্যাঁ বাবু, আমিই সেদিন তাদের তুলে দিয়ে এসেছিলাম তিনটের গাড়িতে।

তখনকার মত ছেড়ে দেয়া হল প্রভাংশুকে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! আবার একসময়ে পুলিশ এসে হাজির।

চলো এবার মেদিনীপুর। আমরা জানি তুমিই সেদিন ছিলে প্রদ্যোতের সঙ্গে। সুতরাং এবার আর তোমার কিছুতে রেহাই নেই।

ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে এক মজার বিবৃতি দিয়েছেন প্রদ্যোৎ। উদ্দেশ্য—পুলিশকে বিভ্রান্ত করে তাদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে সহকর্মীদের রক্ষা করা।

ফণী দাসের উপর যে কি পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে, তা নিজের চোখেই তিনি দেখেছেন। অন্যান্য বন্ধুরাও যে এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই ৪ঠা মে তারিখে নিজে থেকে তিনি এক বিবৃতি দিলেন পুলিশের কাছে।

"আমার সঙ্গী এখানকার কোন লোক নন, কলকাতার লোক। নাম তার হিমাংশুদা। কলকাতার এক পার্কে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনিই রিভলভার নিয়ে আসেন এবং আমরা দুজনে মিলে একাজ করেছি। তাকে চিনতে অসুবিধে হবে না। তার মস্তবড় একজোড়া গোঁফ আছে।"

ব্যস, হয়ে গেল। ধরো এবার বাংলাদেশে যেখানে যত হিমাংশু আছে, তাদের সবাইকে।

সঙ্গে যদি গোঁফ থাকে তো ভালই, তবে না থাকলেও ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে সে যে গোঁফ কামিয়ে ফেলেনি কে বলতে পারে?

ভুল ভাঙল ১৬ই মে তারিখে। সেদিনই সর্বপ্রথম আদালতে হাজির করা হল প্রদ্যোৎকে।

তারপর যা অশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। প্রথমেই প্রদ্যোৎ তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলেন স্বহস্তে লিখিত এক আবেদন পেশ করে।

'ও স্বীকারোক্তি আমি স্বেচ্ছায় দিইনি। পুলিশই দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়ে ওটা লিখে দিতে বাধ্য করেছিল আমাকে।'

একই মন্তব্য করলেন মহামান্য আদালত। আসামীর স্বীকারোক্তি রীতিমত সন্দেহজনক। এ ব্যাপারে পুলিশ যে পন্থা নিয়েছিল, তা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

শুরু হল মামলা। আসামীর সংখ্যা মোট তেত্রিশ জন।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য; প্রভাংশু পাল, নরেন দাস, ধীরেন্দ্র দাস, শৈলেন্দ্র দাস, ফণীন্দ্র দাস, ক্ষিতি সেন, যতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু, পঞ্চুগোপাল ভাদুড়ি, নিরাপদ মুখার্জি, ফণীন্দ্র পট্টনায়ক, বিনোদ-বিহারী সেন, সুশীল সেন, সুধীর ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র সান্যাল, কামাখ্যা ঘোষ, মৃগেন ভকত, রাধাগোবিন্দ গুপ্ত, কার্তিক বসু, শীতল আঢ্য, রাজেন্দ্র চৌধুরী, শশাঙ্ক দাস, বিনয় ঘটক, অমূল্য কুশারী, রামশঙ্কর চক্রবর্তী, শর্বরী ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত সিংহ, সুবল দত্ত, শীতল কর, অনুকূল চ্যাটার্জী, যোগেশ চক্রবর্তী এবং যজ্ঞেশ্বর দাস।

প্রমাণাভাবে বাদবাকি সবাইকে মুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত চার্জসিট দাখিল করা হল একমাত্র প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে।

কিন্তু আর একজন আসামী কোথায়?

না, তার কোন পাত্তা নেই। ইতিমধ্যে তার গ্রেপ্তারের জন্য

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তবু এ প্রশ্নের কোন সুরাহা হয়নি।

৯ই জুন স্পেশাল ট্রাইবুনালের আদালতে শুরু হল বিচার।

বিচারকের সংখ্যা মোট তিন জন। সভাপতি কে. সি. নাগ আই. সি. এস.। বাকী দুজন হলেন বর্ধমানের জেলা ও দায়রা জজ জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই. সি. এস. এবং মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ ভুজঙ্গধর মুস্তাফী।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর আর. এম. ব্যানার্জী। আসামী পক্ষে নিশীথ সেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, রেবতীনাথ মাইতি, মন্মথ দাস, অতুল বসু, জহরলাল অধিকারী, চারুচন্দ্র দাস প্রমুখ আইনজ্ঞগণ।

এ প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে দেখো :

ম্যাজিষ্ট্রেট খুনের মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটর

"ফরিয়াদী সরকার পক্ষ হইতে মামলা উদ্বোধন করিয়া পাবলিক প্রসিকিউটর (আলিপুর বারের রায় বাহাদুর আর. এম. বাড়ুজ্যে) বলেন, এই মামলায় আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ঘরে একটি সভা করিতেছিলেন, সে সময়ে আসামী ও অপর একজন লোক গুলি করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

কতকগুলি দলিল আদালতে উপস্থিত করা হইবে এবং 'ব্রিটিশ উচ্ছেদ সমিতি' নামক এক সমিতির বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যাইবে যে, মেদিনীপুরে একটি গভীর ষড়যন্ত্র বিদ্যমান।···উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত আর একখানা পোষ্টার গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাকযোগে মিঃ ডগলাসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

এই পোষ্টারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথাটি হল : "রক্তে

'আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।" (আনন্দ বাজার: ১০-৬-৩২)

সাক্ষী মোট ত্রিশজন। উল্লখযোগ্য সাক্ষীদের মধ্যে কে কি বলেছেন তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রধান ও প্রথম সাক্ষী তমলুকের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জর্জ। তাঁর বক্তব্য ঃ—

'আমি মিঃ ডগলাসের বিপরিত দিকে টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছিলাম। হঠাৎ ঘন ঘন রিভলবারের শব্দ শুনতে পেলাম। দেখা গেল, দুজন যুবক ডগলাসের পেছন দিক থেকে তাঁর উপর গুলি ছুঁড়ছে। আসামী তাদের একজন।

...আমি পোড়োবাড়ি পর্যন্ত আসামীর অনুসরণ করেছিলাম। গুলিও ছুঁড়েছিলাম কয়েকবার। বসির আলি জঙ্গলের মধ্যে আসামীকে ধরে ফেলে। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। জঙ্গলের ভেতর থেকে আসামীক টেনে আনা হয়।

২নঃ সাক্ষী বসির আলির বক্তব্যের মধ্যে নতুন কিছু নেই। ব্যতিক্রম ৩নং সাক্ষী কাথার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. এন. সেন। স্পষ্টই তিনি স্বীকার করলেন যে, গ্রেপ্তারের পরেই প্রদ্যোৎকে ঘটনা-স্থলে প্রহার করা হয়েছিল অমানুষিকভাবে। তার বক্তব্য :

"আমি 'মারো মৎ'—'মারো মৎ' বলে চীৎকার করেছিলাম। আসামীর পকেট থেকে আমি একটি খাম বের করেছিলাম। তাতে লেখা ছিল—'হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ'। মোট ২২ টাকা তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। তার কপালে জখমের চিহ্ন ছিল এবং গলার কাছে কলারে রক্তের দাগ ছিল।"

এবার শোন ৮নং সাক্ষী সিভিল সার্জন মিঃ ড্রামণ্ডের বক্তব্য :

"সন্ধ্যা ৬টার সময় আমি ডগলাসকে পরীক্ষা করে তার দেহে মোট সাতটি গুলির দাগ দেখতে পাই। চারটি ভেতরে ঢুকবার, তিনটি

বেরিয়ে যাবার। এই জখম গুলি একই রিভলবারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন থেকে ছ' ফিটের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল। রাত ন'টায় তিনি মারা যান।"

এগারো নম্বর সাক্ষী মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজার মিঃ ক্রলির বক্তব্য :

"আমি আসামীর রিভলবার থেকে পাঁচটি বুলেট বের করেছিলাম। এগুলো কোনো কাজ দেয়নি। রিভলবারটি বেশ পুরানো ধরনের।"

এবার খড়গপুরের টাউন দারোগা ধীরেন্দ্রনাথ পাল কি বলেছেন শোন :

"হিজলী বন্দী নিবাস আমারই এলাকায়। গত বছর ১৬ই সেপ্টেম্বর সেখানে গুলি চালানো হয়েছিল। মিঃ ডগলাস ১৭ই থেকে ২১শে পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তার তদন্ত করেছিলেন। অমৃতবাজার এবং অন্যান্য পত্রিকায় ডগলাসের এই রিপোর্ট সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। প্রতিবাদ জানিয়ে মেদিনীপুরে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

শুধু গ্রেপ্তারের সময়ে নয়, পরে থানা হাজতেও যে প্রদ্যোতের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২১নং সাক্ষী সদর হাসপাতালের সহকারী সার্জন চারুচন্দ্র ব্যানার্জীর জবানবন্দীতে। তার বক্তব্য :

"এখনো আসামীর ডান পায়ের উপর দিকে দুটি জখমের চিহ্ন রয়েছে। পয়লা মে তারিখে পরীক্ষার সময়ে এগুলো ছিল না। এটা ইচ্ছাকৃত কোন জখম নয়। কোন কঠিন পদার্থের আঘাতের ফল।"

যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন প্রদ্যোতের রিভলবার কার্যকরী হয়নি। ২৩নং সাক্ষী অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ মিঃ শিলিং-এর অভিমতও তাই। তাঁর বক্তব্য :

"আমি পাঁচটি বুলেট পরীক্ষা করে দেখেছি। বুলেটের মাথায়

রিভলবারের ট্রিগারের আঘাতের দাগ রয়েছে, কিন্তু ড্যাম্প লেগে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার দরুন তা কার্যকরী হয়নি। মিঃ ডগলাসের দেহে যতগুলি বুলেট পাওয়া গেছে তা সবই ৩৮০ বোরের। আসামীর রিভলবার ৪৫০ বোরের। এ রিভলবার থেকে ঐ বুলেট ফায়ার করা কোন মতেই সম্ভব নয়।"

এবার ২৫নং সাক্ষী ঝাড়গ্রামের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. এল. মজুমদার কি বলেছেন শোনা যাক :

"আমি ডগলাসের ঠিক ডানদিকে বসেছিলাম। দুটি যুবককে আমি রিভলবার বার করতে দেখেছিলাম। কাজ শেষ করে তারা পালিয়ে যায়। কিছু কিছু লোক ছুটে যায় তাদের পেছনে পেছনে।"

উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ মজুমদার প্রদ্যোৎকে সনাক্ত করতে পারেননি। যদিও তিনি ছিলেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

এবার প্রদ্যোতের কি বক্তব্য শোনা যাক।

আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ :

"অদ্য সকাল বেলা ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানী উঠিলে পাবলিক প্রসিকিউটরকে সরকার পক্ষের সওয়াল জবাব আরম্ভ করিতে আহ্বান করিবার পূর্বে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীগণ এ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎস্বরূপ সে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে চাহে কি না।

তদুত্তরে আসামী একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করে। সে বলে, —আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ধার্য্য করা হইয়াছে, আমি তদনুসারে কোন অপরাধ করি নাই, কিংবা অন্য কোন অভিযোগ অনুসারেও করি নাই।"...
[আনন্দবাজার : ২২-৬-৩২]

ভেতরে ভেতরে তৎপরতা তখনো সমান ভাবেই চলছে।

• একজন ধরা পড়লেও অন্যজন তখনো পলাতক। যে করে হোক, তাকে ধরতেই হবে। মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিতে হবে। জন্মেও যেন সে শিক্ষা ওরা ভুলে না যায়।

এ প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের সংবাদপত্র থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমি এখানে তুলে ধরছি মীরু। এগুলো থেকেই সেদিনকার মেদিনীপুরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তুমি কিছুটা আঁচ করতে পারবে আশাকরি।

বাঙ্গলায় বৈপ্লবিক বিভীষিকা

প্রতিকারার্থ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি

"ভারত সরকার নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন: বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা বাঙ্গলা সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

অনেক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের নিধন বন্ধ হয় নাই। রাজনৈতিক ডাকাতি, ডাকলুঠ, অস্ত্র-শস্ত্র চুরি এখনও চলিতেছে।

ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এই প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বহুল পরিমানে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী শীতকালে ছয়দল ভারতীয় পদাতিক এবং একদল ইংরেজ পদাতিক বঙ্গদেশে যাইবে এবং যতদিন আবশ্যক ততদিন তথায় থাকিবে।" [আনন্দবাজার: ১৯-৮-৩২]

মিঃ ডগলাসের হত্যাকারী

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. ডগলাস আই. সি. এস এর হত্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং দণ্ডবিধানের উপযুক্ত সংবাদ পাওয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা

হইয়াছিল। এই ঘোষণার মেয়াদ আরো এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইল।" [আনন্দবাজার : ২-৯-৩২]

ওদিকে মামলা চলছে। এদিকে তখন এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় হাত দিলেন প্রভাংশু পাল এবং পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী।

জেল-হাজত থেকে কোর্টে যাবার পথে প্রহরীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে প্রদ্যোৎকে মুক্ত করতে হবে। জান কবুল।

তবে একাজে সর্বাগ্রে প্রদ্যোতের সমর্থন দরকার। নিজস্ব লোক দিয়ে গোপনে তার কাছে একটি চিঠি পাঠানো হোক। দেখা যাক, তিনি কি বলেন এ সম্বন্ধে।

প্রথমেই আপত্তি জানালেন প্রদ্যোতের পক্ষের বিচক্ষণ আইনজ্ঞগণ।

কেসে আমাদের পোজিসন খুব ভাল। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রদ্যোতের রিভলবার কার্যকরী হয়নি। এ অবস্থায় বড়জোর তার দু-দশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, কিন্তু ফাঁসি কিছুতেইই নয়। সুতরাং এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না।

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন প্রদ্যোৎ।

না, এতবড় ঝুঁকি তোমরা নিয়ো না, তাতে তোমাদের অনেকেরই প্রাণ বিপন্ন হবে। যাই হোক না কেন, তার জন্য আমার মনে এতটুকুও দুঃখ নেই। আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে আমি সবসময়েই প্রস্তুত।

বাধ্য হয়েই এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল প্রভাংশু এবং ব্রজকিশোরকে। প্রদ্যোৎ নিজে যেখানে সমর্থন করেননি, সেখানে এ কাজে হাত দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাক্ষীসাবুদ শেষ। এবার উভয় পক্ষের আইনজ্ঞদের সওয়াল…।

সকার পক্ষের দাবী—আসামী অত্যন্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী। তাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।

আসামী পক্ষের বক্তব্য : চরম দণ্ড দেবার জন্য সরকারী উকিল যে জেদ প্রকাশ করেছেন, তা সংকীর্ণতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ঐ উক্তি অত্যন্ত অশোভন, পক্ষপাতমূলক এবং নীতিবিরুদ্ধ।

আমাদের বক্তব্য, আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আদৌ লিপ্ত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তখন সে খেলার মাঠে ছিল। আচমকা গুলির শব্দ এবং হৈ-চৈ শুনে সে ভয়ে ঐ পোড়ো-বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। রিভলবার এবং বুলেট সেই পলাতক আততায়ীর। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যই পুলিশ তাকে আসামী রূপে দাঁড় করিয়েছে।

তারপর সাক্ষী। সাক্ষী বলতে যাদের দাঁড় করানো হয়েছে, তারা সবাই তো দেখছি রাজ-কর্মচারী।

নিরপেক্ষ কাউকে হাজির করা হল না কেন? পোড়োবাড়ির আশেপাশে অন্য লোকও ছিল। তাদের সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল না কেন?

বোর্ডের সেক্রেটারী বিনোদবিহারী রায় তখন ডগলাসের পাশেই বসেছিলেন। ক্লার্ক ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী পাশেই দাঁড়িয়ে তাকে কাগজপত্র দেখাচ্ছিলেন।

তাদের জবানবন্দী নেয়া হল না কেন?

সনাক্তকরণ প্যারেডে এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আসামীকে তারা চিনতে পারলেন না কেন?

১নং সাক্ষী মিঃ জর্জ প্রায় বিশহাত দূরে বসেছিলে। গুলিবর্ষণের জন্য সভাকক্ষে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এতদূর থেকে আসামীকে তিনি চিনতে পেরেছেন। এত কাছে থেকেও বাকী ছাব্বিশ জন তাকে চিনতে পারলেন না কেন সনাক্তকরণ প্যারেডে?

আসামীর রিভলবার বলে যা দেখানো হয়েছে, তা অকেজো।

একটা অকেজো রিভলবার নিয়ে কেউ এ কাজ করতে আসবে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

অন্যতম প্রধান সাক্ষী রক্ষীবাহিনীর বসির আলি তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, সে নাকি পোড়োবাড়ির সামনে ৪৫৫ বোরের একটা বুলেট কুড়িয়ে পেয়েছে।

আসামীর কাছ থেকে যে রিভলভার পাওয়া গিয়েছে, তা ৪৫০ বোরের। ভগলাসের দেহে যে বুলেটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সব ক'টাই ৩৮০ বোরের।

৪৫৫ বোরের বুলেটটা কোথা থেকে এল ? ওটা কি আকাশ থেকে পড়ল ?

বেশ বোঝা যায় যে, ৪৫৫ বোরের রিভলবার নিয়ে অন্য কেউ এসেছিল, পুলিশ যার কোন হদিশ পায়নি।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আততায়ীর সংখ্যা মোট দুজন। প্রথম আসামী অদ্যাবধি পলাতক। আমাদের মতে তিনিই দ্বিতীয় আসামী, যার হাতে ঐ ৪৫৫ বোরের রিভলভার ছিল। এবং বর্তমান আসামী যে নির্দোষ, এটাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ।

সবশেষে বলবো আসামীর অপরিণত বয়সের কথা। এখনো তার আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি। সতেরো পেরিয়ে আঠরোয় পা দিয়েছে মাত্র। এ অবস্থায় আদালতের কাছে সুবিচার এবং সহানুভূতি তার অবশ্যই প্রাপ্য। সেই আশাই আমরা করবো মহামান্য আদালতের কাছে।

গোল বাধল রায় দিতে গিয়ে।

ট্রাইবুনালে বিচারকের সংখ্যা মোট তিনজন। কে. সি. নাগ, তুজ্জধর মুত্তাকী এবং জানাঙ্কুর দে।

প্রথম দুজনের বক্তব্য,—আসামী গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সুতরাং ফাঁসিই তার একমাত্র শাস্তি।

অপরপক্ষে জ্ঞানাঙ্কুর দে তাতে কোনমতেই রাজী নন। তার মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। প্রচলিত নিয়ম, বিচারকের সংখ্যা যাই হোক না কেন, রায় হবে একটিই। কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে সেকথাও ঐ একই রায়ে উল্লেখ থাকবে।

সে নিয়ম অস্বীকার করে এক্ষেত্রে এক নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন জ্ঞানাঙ্কুর দে। তিনি দিলেন আলাদা রায়। তার সেই সুচিন্তিত অভিমত থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'……আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে, এসম্বন্ধে আমি একমত নই। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই এক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট মনে করি।

আসামীর বয়েস মাত্র আঠারো বছর। এমন অসংখ্য নজীর আমি দেখাতে পারি, যেখানে বয়েস কম বলে ফাঁসির পরিবর্তে দ্বীপান্তর দণ্ড দেয়া হয়েছে। এমন কি আঠারো বছরের বেশি বয়স্ক আসামীদেরও চরমদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে।

হত্যার জন্য আসামীকে গৌণতঃ দায়ী করা যায়, কিন্তু মুখ্যতঃ নয়। কারণ তার গুলিতে ডগলাসের মৃত্যু হয়নি। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়েছেন, এমন নজীরের অভাব নেই। প্রকৃত হত্যাকারী এবং তার সহযোগীর মধ্যে দণ্ডের পার্থক্য থাকবেই। এ অভিমত আমার নয়, বিভিন্ন হাইকোর্টেরই। তাহলে বর্তমান আসামীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না কেন?

আমর বন্ধুদ্বয় বলেছেন: "আসামী হত্যার উদ্দেশ্যে বারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দৈবাৎ তার রিভলভার সাড়া দেয়নি, সুতরাং এই দৈব ঘটনার জন্য শাস্তি হ্রাসের কোন কারণ নেই।"

উত্তরে একথাই আমি বলবো যে,—দৈব ঘটনা যদি আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন মরণের পার্থক্য ঘটাতে পারে, তা হলে শাস্তিবিধানের

বেলায়ও পার্থক্য ঘটতে বাধ্য। সে পার্থক্যকে উপেক্ষা করাটা কোনমতেই সঙ্গত হবে না। আমার বন্ধুগণ আসামীকে চরম দণ্ড দিতে চান। আমার মতে ডগলাসের প্রাণহানির জন্য মুখ্যতঃ সে দায়ী নয়। তাই সব দিক বিবেচনা করে আমি তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিলাম।"

অপর দুজন সাজা দিলেন প্রাণদণ্ড। তাদের অভিমত :

"এটা খুবই ক্ষোভের বিষয় যে শাস্তিবিধান সম্বন্ধে আমরা একমত হতে পারিনি। হত্যাপরাধে গৌণভাবে দোষী প্রমাণিত হলে তাকে যে দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড দিতেই হবে, তার কোন বাঁধা নিয়ম নেই।

মিঃ দে আসামীকে যাবজ্জীবন দণ্ড দিতে চান। আমাদের দুজনের অন্য মত। তাই আমরা তার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলাম। আসামী ইচ্ছা করলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাতদিনের মধ্যে হাইকোর্টে অপীল করতে পারবে।"

ধীর, প্রশান্ত চিত্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করলেন প্রদ্যোৎ। যেন মৃত্যুটা তার কাছে একটা খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রহরীদের সঙ্গে যেতে যেতে বাইরের উদ্বিগ্ন জনতার দিকে তাকিয়ে একটি মাত্র কথাই বললেন প্রদ্যোৎ,—"এতে ভয় পাবার কি আছে! মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে আমি অমরতার গান শুনতে পাচ্ছি।"

পরদিনই দণ্ডাদেশের খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদ-পত্রের পাতায় :

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রাণদণ্ড

অদ্য প্রাতে ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। নরহত্যার অপরাধে আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সে শান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে। [আনন্দ বাজার : ২৫-৬-৩২]

৩০শে জুন আপীল করা হল হাইকোর্টে। শুনানীর দিন ধার্য হল ১৬ই আগস্ট!

এখানেও বিচারকের সংখ্যা তিনজন। মিঃ জ্যাক, সি. সি. ঘোষ, এবং এম. সি. ঘোষ।

প্রদ্যোতের পক্ষে রইলেন এন. সি. সেন, জে. পি. গুপ্ত এবং হীরালাল গাঙ্গুলী প্রমুখ আইনজীবিগণ। সরকার পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এন. এন. সরকার এবং অ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

কিন্তু সব বৃথা। কারণ মেদিনীপুর। মেদিনীপুরকে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। প্রদ্যোৎ সেই মেদিনীপুরেরই ছেলে। সুতরাং অন্যত্র যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে খাতির করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

আপীল না-মঞ্জুর করা হল ২২শে আগষ্ট। না, ঠিক সাজাই দেয়া হয়েছে। একজন বিচারক ভিন্নমত পোষণ করলেও তাতে কিছু ক্ষতি নেই। মেজরিটি হিসেবে বাকী দুজনের দেয়া সাজাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ প্রাণদণ্ড।

সেই সঙ্গে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করা হল বিচারপতি জ্ঞানাঙ্কুর দে সম্বন্ধে। রায়ে বলা হল :

"মিঃ দে এ মামলা সম্বন্ধে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তার উচিত সহকর্মীদের কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করা এবং একই রায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করা। পৃথক রায় দেবার কোন অধিকার মিঃ দে-র ছিল না। তিনি যা করেছেন, তা আইন বিগর্হিত।

আসামীর বয়স কম, নিশ্চয় এটা বিবেচনার বিষয়। তা বলে আসামীকে লঘুতর শাস্তি দিতে হবে, এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই।"

তবু নিজের বক্তব্য থেকে একচুলও নড়লেন না জ্ঞানাঙ্কুর দে। তার এক কথা—হাইকোর্ট যাই বলুক না কেন, আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি।

এমনকি পরবর্তী কালেও তার এই মনোভাবের এতটুকুও পরিবর্তন ঘটেনি মীরা। তখনো তার সেই একই বক্তব্য। প্রদ্যোতের ব্যাপারে আমি যা করেছিলাম, তাই ঠিক।

১৯৪৩ সালের কথা। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে।

জ্ঞানাঙ্কুর দে তখন ঢাকার জেলা জজ। কথায় কথায় একদিন এক ঘরোয়া আলোচনায় আমি প্রদ্যোতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম তাঁর কাছে।

উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন জানো?

নাম শুনে নিমেষে দপ্ করে জ্বলে উঠে তিনি বলেছিলেন:

"অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! যেভাবে প্রদ্যোৎকে সেদিন ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছিল, তাকে আমি একটা বিচারের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনে। কবেকার কথা যেন! হ্যাঁ, এগারো বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজো আমি ভুলতে পারিনি তার সেই মায়াভরা চোখ দুটিকে। পুয়র বয়। আমি তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম, তবু পারিনি। আমি হেরে গিয়েছিলাম।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ। তারপরই এক সময়ে উত্তেজিতভাবে উঠে দাড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে করতে তিনি বলেছিলেন:

"হেরে গিয়েছিলাম, তারজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমার আসল দুঃখ কোথায় জানো? সেদিন ট্রাইব্যুনালের অন্য দুজন বিচারপতিও ছিলেন আমারই মত বাঙালী। সত্য ও ন্যায়ের চাইতে মনিবকে খুশি করাটাকেই সেদিন তাঁরা বড় কাজ বলে মেনে নিয়েছিলেন।"

যাক, পরের কাহিনী শোন।

হাইকোর্টের পর প্রিভি কাউন্সিল।

প্রিভি কাউন্সিলে শুনানী উঠল ১৫ই নভেম্বর। রায় দেয়া হল ১৮ই নভেম্বর। সেই একই সাজা। প্রাণদণ্ড।

শেষ উপায় গভর্ণরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়া।

তাই করলেন প্রদ্যোতের মা পঙ্কজিনীদেবী। ১৯শে নভেম্বর তিনি সন্তানের প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন জানালেন গভর্ণরের কাছে।

আবেদন অগ্রাহ্য করা হল ২৩শে নভেম্বর। না, কোন ক্ষমা নয়। ফাঁসিই ওর একমাত্র শাস্তি।

ছোটলাটের পর বড়লাট। বড়লাটের কাছে আবেদন জানানো হল ২৬শে নভেম্বর।

জবাব পাওয়া গেল ১৪ই ডিসেম্বর। না, এ ব্যাপারে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর কে বাকী আছে! হ্যাঁ, মহামান্য সম্রাট। এবার তার কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে।

বাধা দিলেন প্রদ্যোৎ। মায়ের এ সমস্ত প্রচেষ্টার কথা শুনে গোপনে তিনি তার কাছে খবর পাঠালেন কমডেমণ্ড সেল থেকে। আমার একান্ত অনুরোধ, এভাবে তুমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ইংরেজের দারস্থ হয়ো না মা। তুমি তো জানো যে, রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে কোনদিনই আমি রাজী ছিলাম না।

মায়ের প্রাণ! তাই মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে রক্ষা করার জন্য ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে শেষবারের মত মা আবেদন জানালেন মহামান্য সম্রাটের কাছে।

জবাব এল ২১শে ডিসেম্বর। আবেদনপত্র বড়লাটের মাধ্যমে আসেনি, সুতরাং এটা বে-আইনী। ফাঁসি স্থগিতের আবেদনও নামঞ্জুর।

এবার বড়লাটের মাধ্যমেই একটি আবেদন পাঠাতে চেষ্টা করলেন পঙ্কজিনী দেবী, কিন্তু সব বৃথা। মাঝপথেই সে আবেদন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল গোপন হস্তের ইঙ্গিতে।

সেই শেষ। বোঝা গেল যে, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন,

ওদের হিংস্র থাবা থেকে প্রদ্যোতকে রক্ষা করার কোন উপায়ই আর নেই। সে আশাও সুদূরপরাহত।

প্রদ্যোৎ নির্বিকার। শুরু দীনেশ গুপ্তের মতই নির্জন কারাকক্ষে প্রহরগুলি তার কাটতে লাগল নানাবিধ বই ও ধর্মগ্রন্থ পড়ে।

শুধু পড়া আর পড়া। রাতদিন পড়া। সময় তো ঘনিয়ে এল। তবু এই অবসরে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়। এর কি শেষ আছে কোথাও!

তবু মাঝে মাঝে মন উদাস হয়ে যায় বিধবা মায়ের কথা ভেবে মা হয়তো কত ভাবছেন। মায়ের মত এমন কে আর আছে সংসারে?

এবার আমি প্রদ্যোতের লেখা তিনটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি মীরা।

ফাঁসির পূর্বে আলিপুর জেল থেকে লেখা দীনেশ গুপ্তর সেই চিঠিগুলি কোথাও না কোথাও তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। এবার এগুলোও পড়ে দেখ। দেখবে,—ঠিক যেন দীনেশ গুপ্তেরই প্রতিচ্ছবি।

প্রথম চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন বড়ভাই প্রভাত ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে। সেন্সার করা চিঠি। স্বভাবতই বিস্তর কাটাছেঁড়া রয়েছে। তবু তার মূল বক্তব্য তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে না আশা করি।

"...জেলের নির্জনতা আমার বেশ ভাল লাগছে; কেন না এই নির্জনতাই আমার জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে দেখবার সুযোগ দেয়। আর সব অন্যান্য কারণ ছেড়ে দিলেও আমার এই নির্জনতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে অনেকখানি লাভবান করতে পারবে বা করছে। আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ, প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবকশিখা।

আমি বেশ আনন্দেই আছি। জীবনে এত আনন্দ আর আমি কখনো পাই নাই।"

২২শে নভেম্বর তারিখে দ্বিতীয় চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন বৌদি বনকুসুম দেবীর উদ্দেশ্যে :

"...আমার যাওয়ার কল্পনা, যা এতদিন মনে করে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসেছি, তা সফল হতে চলল।

...আমার এ যে আশাতীত, ধারণাতীত লাভ। ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, যে কোন উপাস্যের জন্য ত্যাগের, এমনকি জীবন-বিসর্জনের দৃষ্টান্তের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা উল্টাবার প্রয়োজন নাই ; আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়তই আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

...গীতাঞ্জলীতে আছে :

"আকাশ হতে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই উঠল রে।"

কবির এই ছন্দটা যেন আমার জীবনের প্রতিধ্বনি। আমার এই জীবনের খাতায় তার কোন অক্ষরটিই যেন বাদ যাচ্ছে না। সবই যেন সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ তো গান শোনা নয়, বা কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে মর্মে মর্মে অনুভব।

জীবনটা কি। একটা অনুভবের স্মষ্টি বই তো নয়। এ অনুভবের সুধাধারাই তো মানবের জীবন। এবং সেই একটানা জীবনস্রোত যেদিন একটা প্রবল অনুভবের আবর্ত সৃষ্টি করে, তারই নাম তো প্রাণের জাগরণ।

তাই আমার জীবনের এই অভিব্যক্তির মধ্যে বিশ্বকবির গানের এই আশ্চর্য মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। তারপর আমার যে আত্মা, এ আত্মা যে শুধু অমর তা নয়, এর শক্তি অপরিমেয়। এ যে শুধু অক্ষয় অবিনশ্বর তা নয়, এ যে বিভু, এ যে অসীম।

সেই অসীমতা, সেই বিভুত্ব শুধু মায়ায় আবৃত হয়ে আছে।

বুঝলেই মায়া ছুটে যাবে। আসি আমি, কেমন? এই বাংলার কোলেই আবার ফিরে আসব গৌরবের সঙ্গে।"

তৃতীয় চিঠিখানি তিনি লিখছিলেন মা পঙ্কজিনীদেবীর উদ্দেশ্যে। এ চিঠিখানি এসেছিল সবার অগোচরে, গোপনে। তাই আগাগোড়া এটা অক্ষত ছিল সেন্সারের কাঁচি ও কলম থেকে।

চিঠিটা তুমি ভালো করে পড়ে দেখো মীরা। এ চিঠি থেকে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বিস্মৃতপ্রায় সেই অগ্নিযুগের একটি মৃত্যুপথ-যাত্রী তরুণের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পারবে আশা করি।

মনে রেখো, তখনো তার বয়েস আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি। সতেরো পেরিয়ে সবে আঠারোয় পা দিয়েছে মাত্র। যাক, শোন:

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী

মাগো,

আমি যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি, তার জন্য কোন শোক করো না। আমার ভাইদের বলো যে, আমার অসমাপ্ত কাজের ভেতরে আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্য দুদিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ করা হবে এবং আমার আত্মাও তাতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আজ যদি কোন ব্যারামে আমায় মরতে হত, তবে কি আপসোসই না থাকত সকলের মনে। কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি, তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠছে, মন খুশিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরেজদের একটা পুরনো রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

মা, তুমি কিন্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে

পারবে না। তুমি হয়তো জান না, তোমরাই নিজের প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করেছ, কিন্তু তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের—অর্থাৎ বাংলার মায়েদের মনে অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি হচ্ছিলাম। আজ ধীরে ধীরে আমরা আত্মপ্রকাশ করছি।

আর আমি চিরদিনই জানি যে, আমি বাঙালী, আর তুমি বাংলা, একই পদার্থ, কোনদিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারিনি। তাই কোন বিপদাশঙ্কাই আজ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছ, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহই আমি।

সেই বিপ্লব আজ যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন?

আমার এই কথাটা খুব সত্য বলে জেনো। আর তোমায় যদি কেউ খুনীর মা বা ডাকাতের মা বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে, তবে নিজজ্ঞানে অন্তরের নিরূপম সৌন্দর্য বহন করে, নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করো।

'মানুষকে আমরা খুন করি না। মানুষকে আমরা বাঁচাই।'

একথা বাংলা দেশে এখনো বোঝানো হয়নি। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস ক'দিনেরই বা। তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণে প্রচারিত হয়নি। সেইজন্য লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা করেনি।

আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে পদেই। ইংরেজ আমাদের কালিতে চিহ্নিত করে, কিন্তু ভারী দুঃখ হয় যখন অহিংস বন্দীরাও আমাদের হিংস্র বলে নিন্দা করে। তখন মনে হয়, পরাধীন দেশে এটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি, তা অহিংসাবাদীদের কল্পনারও অতীত। মানবের হিংস্রতা থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পঁচিশ বছরের শিশু। এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখেনি। তাই অনেকের গলাবাজির চোটে হয়তো তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়।

কিন্তু আজ এই শিশুকণ্ঠ হতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা শীগগিরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে।

লোকে আমাদের ভাবপ্রবণ বলে উপহাস করে।

কিন্তু আমি এটা ভেবে পাই না, এই বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে, যারা নেহাত ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে, এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তারা একজোটে ভাবপ্রবণ হয় কি করে?

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন—'ভ্রান্তযুবক' এবং করুণায় বিগলিত হয়ে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদের 'ভ্রান্ত' পথ থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন। এমনকি খুব নিঃস্বার্থভাবে কমিটিও নাকি গঠন করেছেন শুনেছি।

বুঝলে মা, এর ভিতরে কিছুই নেই। শুধুই উপর-চালাকি।

আসল কথাটা কি জান মা, যাঁরা এরকম উঠে পড়ে আমাদের ফেরানোর চেষ্টা করছেন, হয় তাঁরা অথর্ব—নয় কাপুরুষ।

কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। কিন্তু এ জিনিসটা দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ।

'বিপ্লব' জিনিসটা কিছু আমাদের নয়। কিন্তু মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছে।

বৃদ্ধ যারা তাঁদের নমস্কার করি। তাঁরা আমার পূজ্য, কিন্তু তাদের জরাগ্রস্ত দেহ মন নড়ে চড়ে বসবার সাময়িক কার্যটাকেও খুব

বড় করে দেখেন এবং নতুন জলে ভেসে আসা আগাছার মত আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারিনে।

কি করবো! তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়।

যাঁদের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি দাসত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে, তাঁদের কথা ভাবি নি। প্রকৃতির নিয়মে তাঁরা নিজের ক্ষেতে নিজেরা পচে মরবেন, স্বখাত সলিলে ডুবে মরবেন।

কিন্তু যারা মধ্যপন্থী, আপস মীমাংসায় এখনো বিশ্বাসবান, তাঁদের জন্য দুঃখ হয়, কষ্টও হয়। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে, নাই কেবল আত্মসম্মানজ্ঞান। এ বস্তু জোর করে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, বোঝানোও যায় না। এটা যৌবনের ধর্ম।

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নির্যাতন করে এবং আমি যদি পাগলের মত লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই, তবে কোনও সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা ওর সঙ্গে পারব কি না, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে বেটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপস মীমাংসা করা যাবে কিনা, আর অত্যাচারী যদি ধরা না পড়ে, তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা ইত্যাদি করে ীর মস্তিষ্কের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেব সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাতৃহৃদয়টা কি ছি ছি করে জ্বলে উঠবে না—ছেলেবেলায় বুকের দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই ক্লেদের পিণ্ডটাকে মেরে ফেলিনি?

কি অমৃত স্পর্শে যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায় তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকেন। নইলে এটা একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপারমাত্র।

বেশি আর কি বলব! জীবনে অনেক আশাই ছিল যে, দেশের মধ্যে আমার আদর্শটাকে অস্ত্রে অস্ত্রে ছড়িয়ে যাব, নবযুগের

সুস্থ দেখাচ্ছে। আজ আমার যে কি আনন্দ তা তোমাকে আমি কি করে বোঝাবো!"

—টাইম হো গিয়া। আদেশ জানাল কারারক্ষী, এবার যেতে হবে।

চট্ করে সরে গেলেন প্রদ্যোৎ। কি লাভ শুধু শুধু মাকে দুঃখ দিয়ে! তার চাইতে আগে থাকতেই সরে যাওয়া ভাল।

আর দুজন লোক সে সময় প্রদ্যোৎকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলে।

একজন প্রদ্যোতের পক্ষের আইনজীবী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ প্রদ্যোৎকুমার' গ্রন্থ থেকেই তার বিবরণ এখান তুলে দিচ্ছি ঃ

"মন্মথবাবু বেলা দশটার সময় জেলখানায় সাক্ষাতের জন্য গিয়া দেখেন, একখানা কম্বলের উপর বসে তিনি গীতাপাঠ করিতেছেন। মন্মথবাবুকে দেখিয়া প্রদ্যোৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও যুক্তকরে অভিবাদন জানাইলেন।

তিনি দেখিলেন, কি অপূর্ব জ্যোতিতে প্রদ্যোতের মুখখানি ভরিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও লাবণ্যের অনুপম ছটায় যেন ক্ষুদ্র মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মন্মথবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রদ্যোৎ কুমার তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মন্মথবাবু এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ থেকে কোন কথা বাহির হইল না। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

—গীতা পড়ছ?

...হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে?

—এমন আনন্দ কখনো পাইনি। যত পডছি, ততই যেন আমার

জীবনের সকল সমস্যাগুলি দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেন আনন্দ সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।

ভাবপ্রবাহে মন্মথবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মরণযাত্রী বীরের প্রতি অন্তরের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

অন্যজন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং প্রদ্যোতের পক্ষের আর একজন আইনজীবী শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ মাইতি। প্রদ্যোতের সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বর্গীয় মহাপাত্র বলেছেন ঃ

"ফাঁসির দু'একদিন পূর্বে রেবতীনাথ জেল পরিদর্শন করিতে যান এবং সেই উপলক্ষ্যে প্রদ্যোতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিচারালয়ে বরাবরই প্রদ্যোৎকে দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ঐ দিন কারাকক্ষের অন্তরালে প্রদ্যোৎকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। তাহার দেহ বহু পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল সুপুষ্ট ও হাসিতে পরিপূর্ণ।

তিনি হাসিমুখে শ্রীযুক্ত মাইতির কুশল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন— "মৃত্যুদণ্ডের পর হইতে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এমন জীবনে কখনো উপভোগ করেন নাই। যতই ফাঁসির দিন আগাইয়া আসিতেছে, ততই তাঁহার আনন্দ ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন চিন্তা, কোন দুঃখ, কোন ভয় তাঁহার সে আনন্দকে ম্লান করিতে পারে নাই।"

এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বালকের অদ্ভুত মনোবলের কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীযুক্ত মাইতি শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আসিলেন।"

কথাটা অত্যুক্তি নয় মীরা। স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করার আদেশ পেয়ে সত্যিই বুঝি সেদিন আনন্দের আর সীমা পরিসীমা ছিল না প্রদ্যোতের। প্রমাণ, সেদিনের সংবাদপত্র।

ফাঁসির আসামী প্রদ্যোৎ

শরীরের ওজন বৃদ্ধি

"গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে প্রদ্যোতের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শক্তিময় ভট্টাচার্য প্রদ্যোতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে প্রফুল্লই দেখতে পান। তাঁহার শরীরের ওজন ১২৬ পাউণ্ড হইয়াছে।

২য় শ্রেণী নির্দেশ করার জন্য তাঁহার পক্ষে যে দরখাস্ত কর হয় তাহা এখনও কতৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।" [আনন্দ-বাজার : ২-৯-৩২]

ডিসেম্বর শেষ। শুরু হল নতুন বছর।

যথাসময়ে একদিন প্রদ্যোৎকে জানিয়ে দেওয়া হল সরকারী সিদ্ধান্তের কথা।

আর দেরী নয়। তোমার শেষ অভিলাষ কিছু থাকলে জানাও।

—কোন অভিলাষ নেই। দৃঢ়স্বরে জানালেন প্রদ্যোৎ, কোন অনুগ্রহ আমি চাইনে ইংরেজ সরকারের কাছে।

—কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও কি ?

—না, তবে কেউ যদি দেখা করতে চায়, আমি তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবো না।

—মা-র সঙ্গে শেষ দেখা করার ইচ্ছা আছে কি ?

—না।

কথাটা বলেই চট করে সরে গেলেন প্রদ্যোৎ। কি লাভ মাকে এসবের মধ্যে টেনে এনে! শুধু শুধু তাঁর দুঃখ বাড়ানো বই তো নয়। তার চাইতে এসময়ে তাঁর দূরে থাকাই মঙ্গল।

মায়ের প্রাণ ; তাই প্রদ্যোৎ না চাইলেও ফাঁসির পূর্বে তাকে একবার শেষ বারের মত দেখার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন মা পঙ্কজিনী দেবী। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত প্রদ্যোৎ কুমার

"ডগলাস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য্যের ফাঁসির পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রদ্যোতের ভ্রাতা বাবু প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য গতকল্য মেদিনীপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

তিনি অদ্য প্রভাতবাবুকে জানাইয়াছেন যে, প্রদ্যোতের সম্পত্তি সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য আগামীকল্য সকালবেলা তাঁহার মাতা এবং অপর তিনজন আত্মীয় ও একজন আইন ব্যবসায়ীকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে।" [আনন্দবাজার : ১১-১-৩৩]

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। অবশেষে এল সেই ১৯৩৩ সনের ১১ই জানুয়ারী।

সকাল থেকেই মেদিনীপুর জেলে সেদিন সাজ সাজ রব। উপর থেকে নির্দেশ এসে গেছে। আর দেরি নয়। কালই।

প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতেও মোম মাখানো হয়ে গেছে। সমান ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন শুধু ভোর হবার অপেক্ষা মাত্র।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। তারপর রাত্রি। থমথমে কালো রাত্রি।

কেই ঘুমিয়ে নেই সেদিন রাজনৈতিক বন্দীমহলে। সবাই জেগে রয়েছেন দুর্নিবার একটা জ্বালা নিয়ে।

সহকর্মী প্রদ্যোৎ। শুরু না হতেই তার জীবনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল পরাধীনতার মাশুল দিতে গিয়ে। এমনি করে আরো কতজনের যেতে হবে কে জানে!

তা বলে এ অন্যায় আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। প্রদ্যোতের হত্যার বদলা আমরা নেবই।

বুঝিয়ে দেবো যে, শুধু পেডি বা ডগলাসই নয়, আরো অনেককেই এমনি করে শেষ শয্যা নিতে হবে ওদের ঐ কবরখানার মাটিতে।

পিস্তলের ট্রিগার উঁচিয়েই আছে। শুধু নেমে আসার অপেক্ষা মাত্র।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলে।

সহসা একসময়ে সব কিছু ছাপিয়ে প্রদ্যোতের দূরাগত কণ্ঠ ভেসে আসে মিষ্টি সঙ্গীতের মত—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।'

বিরাট জেলখানাটাতে মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধতা। নানা মতের, নানা ধর্মের লোক। তবু কিসের যেন একটা না বলা ব্যথায় সবার মনই সেদিন এক অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। প্রদ্যোতের কণ্ঠ আজো তেমনি সুরেলা। তেমনিই মধুময়।

কিন্তু কাল?

সব যেমন ছিল, তেমনিই থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু প্রদ্যোতেরই কোন সাড়া মিলবে না।

তার আগেই নির্মম ঘাতক তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেবে চিরদিনের মত।

১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ সন।

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

প্রদ্যোৎ প্রস্তুত। সারামুখে তার নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। কোথাও তার এতটুকু মালিন্য নেই।

সহসা কি শুনে সারামুখে একটুকরো রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল প্রদ্যোতের।

কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে তালে তালে পা ফেলে। স্পষ্ট তাদের বুটের ভারী শব্দ ভেসে আসছে—গট্‌গট্‌ গট্‌গট্‌ গট্‌গট্‌ গট্‌গট্‌।

• এ সময়ে কারা যে এগিয়ে আসছে সে কথা তার অজানা নয়। লগ্ন সমাগত। এবার যেতে হবে।

কাছে এসেই রক্ষীদল অবাক।

আশ্চর্য, স্নানশেষে পূজো শেষ করে এরই মধ্যই প্রদ্যোৎ প্রস্তুত। মুখে তার প্রশান্ত হাসি। সে হাসিতে কোথাও এতটুকু জ্বালা নেই। ক্ষোভ নেই। দুঃখ বা বেদনার চিহ্নও নেই।

রক্ষীদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপর নিজে থেকেই গিয়ে ফাঁসিমঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন বড় বড় পা ফেলে। যেন এ একটা খেলা মাত্র।

—আর ইউ রেডি প্রদ্যোৎ? প্রশ্ন করলেন ডগলাসের পরবর্তী জেলাশাসক মিঃ বার্জ।

—নিশ্চয়ই। হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি যে, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু বাংলার ঘরে ঘরে শত শত প্রদ্যোতের সৃষ্টি করবে। আমি ভাবছি তোমার কথা।

—আমার কথা! মিঃ বার্জ অবাক।

—হ্যাঁ তোমার কথা। সত্যি, আমার দুঃখ হচ্ছে তোমার কথা ভেবে। তুমি তো জান, বিপ্লবীর শপথ ফাঁকা আওয়াজ নয়! তা সত্ত্বেও কেন তুমি এসেছ আমাদের এই মেদিনীপুরে? সত্যি দুর্ভাগ্য তোমার। যাক আমি প্রস্তুত। এবার তোমার কাজ তুমি করতে পার! বন্দে মাতরম্।

নিমিষে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা জেলখানার উপর দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত আটক রাজনৈতিক বন্দী ধ্বনি তুললেন—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্। শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ!

তাদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য

জিন্দাবাদ! প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ! প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে রব উঠল—শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ। তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলবো না।

পরদিনই সে খবর বড় বড় হেডলাইনে প্রকাশিত হল সংবাদ-পত্রের পাতায়।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি
ভোর পাঁচটায় সব শেষ

মেদিনীপুর, ১২ই জানুয়ারী ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যর ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোরবেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতাপাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের উপর গিয়ে উঠে, তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জহ্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে।…[আনন্দবাজার : ১৩-১-৩৩]

প্রদ্যোৎ চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাদের

একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি জাতির অন্তরে বেঁচে রইলেন চিরকাল।

আর একজন বেঁচেও মরে রইলেন সবার অলক্ষে। কেউ তাকে চেনে না। জানেও না কেউ তাঁর নাম।

তিনি হলেন প্রদ্যোতের সেজদা শর্বরী ভট্টাচার্য।

কি অমানুষিক নির্য্যাতনই না পুলিশ সেদিন করেছিল এই শর্বরী ভট্টাচার্য্যের উপর। 'বলো প্রদ্যোতের সংগে আর কে ছিল! নিশ্চয়ই তুমি জানো। বলতেই হবে তোমাকে।'

শেষ পর্যন্ত উন্মাদ রোগ। সেই থেকেই তিনি রাচীর মানসিক হাসপাতালে। এখনো তাই। ইতিমধ্যে আটত্রিশ বছর কেটে গেছে, তবু তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

কেমন আছেন এখন শর্বরী?

না, সে খবর শহীদ জননী পঙ্কজিনী দেবীর জানা নেই। এতদিন মেজছেলে শক্তিপদ তাঁর খোঁজ খবরাদি এনে দিতেন। চারবছর আগে তিনিও চলে গেছেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে। কে এনে দেবে এখন তাঁকে হতভাগ্য শর্বরীর খবর? না, কেউ নেই। [২০-৯-৭০ তারিখে শহীদ জননী পঙ্কজিনী দেবীর মুখ থেকে শোনা]

যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। প্রদ্যোৎ চলে গেলেন। কিন্তু মেদিনীপুর! মেদিনীপুর যে চিরদিনই শক্তির উপাসক। তারা কি রক্তের অক্ষরে লেখা সেই শপথকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল?

হয়েছিল বৈকি! প্রমাণ—ইতিহাস।

ইতিহাস জানে যে, কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের সেই কবর খানায় আরো একটি নতুন কবর খুঁড়তে হয়েছিল দুর্দান্ত জেলাশাসক পেডি ও ডগলাসের পাশে।

এবং কখন? কি অবস্থায়? কোন পরিপ্রেক্ষিতে?

যখন বিপ্লবীদের দমন করার জন্য 'ব্ল্যাক এ্যাণ্ড ট্যান' নীতির প্রবর্তক, মহাশক্তিমান ব্রিটিশ শাসক. স্যার জন এণ্ডারসন স্বয়ং বাংলার মসনদে সমাসীন।

যখন তাঁর মারাত্মক চণ্ডনীতির ফলে বাংলার যৌবন কারারুদ্ধ। যখন হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে কারাগারে বন্দী। কেউ বিচারের প্রহসনে, কেউ বা বিনা বিচারে।

যখন সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ থেকে সুরু করে মেজর সত্য গুপ্ত, সত্য বক্সী, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায়, মণীন্দ্র রায়, হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, ভূপতি রায়, প্রফুল্ল দত্ত, কমেট দাসগুপ্ত প্রমুখ বি-ভির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারা প্রাচীরের অন্তরালে।

যখন মেদিনীপুরের প্রথম-সারির কর্মীদের মধ্যে পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক, বিমল দাসগুপ্ত, ফণী দাস, নরেন দাস, ক্ষিতি সেনগুপ্ত, প্রভাংশু পাল প্রমুখ কেউ বড় একটা বাইরে নেই।

যখন এণ্ডারসনের অমর কীর্ত্তি 'ভিলেন গার্ড' বাহিণী থেকে সুরু করে অসংখ্য গুপ্তচরের দল বাংলাদেশের সর্বত্র বিপ্লবীদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত।

ঠিক তখন।

কি একটা উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়ে সে কি দম্ভোক্তি এণ্ডারসনের।

"মনে হয়, মেদিনীপুরের টেরোরিষ্টরা আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে, কোন শ্বেতাঙ্গ জেলা শাসককেই তারা জীবিত থাকতে দেবে না। বেশ, আমরা তাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। একদল সৈন্য ইতিমধ্যেই এখানে এসে গেছে। কোন কিছু হলে তখন তাদের যা করণীয় নিশ্চয় তারা তা করবে।"

ঠিক ডান পাশেই বসে ডগলাসের পরবর্তী জেলাশাসক মিঃ বার্জ।

এণ্ডারসনের প্রতিটি কথায় মাথা নেড়ে নেড়ে সেকি তার উৎসাহ

প্রদর্শন। ঠিকই বলেছেন বঙ্গেশ্বর স্যার জন এণ্ডারসন। এইতো চাই। এইতো হওয়া উচিত। ব্রিটিশ রাজত্বকে ভাবনামুক্ত করতে হলে এমনি করেইতো নির্মূল করা উচিত টেরোরিষ্টদের।

'বটে! ঠিক আছে, রইল চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক, কার কত হিম্মত।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন বি-ভির যতীশ গুহ, যার সঠিক পরিচয় তখনো পর্যন্ত পুলিশের অজ্ঞাত।

কে এই যতীশ গুহ? কি তার পরিচয়?

কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্যতম সদস্য প্রফুল্ল দত্তের নির্দেশে বি-ভির মেদিনীপুর শাখা পরিচালিত হতো সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি।

হঠাৎ তিনি একদিন ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। ফলে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এই যতীশ গুহ। তখন থেকে মেদিনীপুর শাখা পরিচালনার দায়িত্ব এসে গেল প্রধানতঃ তাঁরই ওপর।

একই চ্যালেঞ্জ তখন মেদিনীপুরের অবশিষ্ট তরুণদলের। গোপন চ্যালেঞ্জ নয়, প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা মেদিনীপুরে থাকতে দেবো না। যে আসবে, তাকেই আমরা খতম করবো।

১৯৩১ সালে আমরা পেডিকে খতম করেছি।

১৯৩২ সালে ডগলাসকে।

১৯৩৩ সালে 'হ্যাট্রিক' করে দেখিয়ে দেবো যে, চ্যালেঞ্জের জবাব আমরা দিতে পারি কি না।

প্রমাণ পরবর্তী কালে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিবরণ। এই বিবরণ থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুরে সেদিন কিভাবে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল শক্তিমান ব্রিটিশ সরকারকে।

মেদিনীপুরে বৈপ্লবিক ইস্তাহার

"মেদিনীপুরকে ম্যাজিষ্ট্রেটশূন্য থাকিতে হইবে"—এই কথা কয়টি

লেখা একখানা ইস্তাহার আজ শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগান দেখা যায়। কোথা হইতে এই সকল ইস্তাহারের উদ্ভব হইল এতাবৎ তৎসম্পর্কে কোন সূত্রই আবিষ্কৃত হয় নাই।

মেদিনীপুর শহরে পুনরায় এই বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার আত্মবিকাশে শহরের সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সম্পর্কে এতাবৎ কাহারও গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পাওয়া যায় নাই।" [আনন্দবাজার : ৫-১০-৩৩]

এ প্রসঙ্গে আমি পরবর্তী কালে প্রকাশিত আরো একটি সংবাদের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মীরা।

মেদিনীপুরে সৈন্যদল

"৪ঠা নভেম্বর হইতে ৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মেদিনীপুর ও খড়গপুর সহরদ্বয়ে সৈন্যদল কর্তৃক কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় প্রদর্শিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে।" [আনন্দবাজার : ৪-১১-৩৩]

দেখো, দম্ভ প্রকাশের কি বিরাট আয়োজন। ভাবটা এই যে,—খুব সাবধান। ভালচাও তো এখনো শান্ত হও। নইলে দেখছ তো আমাদের কত শক্তি। মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো না!

শুধু মিলিটারী নয়, সেই সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে পুলিশী তৎপরতা। এমনকি নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরও রেহাই নেই এই নির্য্যাতন থেকে। প্রমাণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত আর একটি বিবরণ।

কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁর ভবনে খানা তল্লাসী

"আই বি পুলিশ বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশসমেত অদ্য প্রাতে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁর মেদিনীপুরস্থ বাসভবনে হানা

দেয় এবং প্রকাশ, অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে উক্ত বাড়ীতে তন্নতন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।"
[আনন্দবাজার ঃ ১২-১০-৩৩]

মীরা, বিশ্বাস কর, আর নাই কর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত এই ছিল সংগ্রামী মেদিনীপুরের সত্যিকারের চেহারা।

বলা বাহুল্য যে, ডগলাসের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

একদিকে শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাদের সদম্ভ চ্যালেঞ্জ —মেদিনীপুরকে আমরা শিক্ষা দেবোই।

অন্যদিকে মুষ্টিমেয় বিপ্লবী তরুণমাত্র। আর অস্ত্রশস্ত্র! সেতো বলতে গেলে কিছুই নয়। তবু নিজের সঙ্কল্পে তারা অটল, অনড়। হ্যাঁ, রইল চ্যালেঞ্জ। আসুক পুলিশ। আসুক মিলিটারী। দেখি, কে তাঁকে রক্ষা করে আমাদের হাত থেকে। শুধু সুযোগমত একবার পেলেই হয়।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, পুলিশ ময়দানে।

হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে পরবর্তী জেলা শাসক বার্জকে খতম করে কিভাবে যে তারা সেদিন তাঁদের বিপ্লবী শপথকে স্বার্থক করে তুলেছিলেন, সে কাহিনীতো তুমিও জানো।

অবশ্য মূল্যও তারজন্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। দিতে হয়েছিল অফুরন্ত প্রাণ সম্পদে ভরপুর পাঁচ পাঁচটি তরুণ প্রাণ।

তাদের মধ্যে অনাথ পাঁজা আর মৃগেন্দ্র দত্ত ঘটনাস্থলেই প্রাণ দিলেন রক্ষীবাহিনীর গুলিতে। নির্ম্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায় প্রাণ উৎসর্গ করলেন ফাঁসির রজ্জুতে।

তা বলে বি-ভির কর্মকাণ্ড অবশ্য এখানেই শেষ হল না।

১৯৩৪ সালের ১০ই এপ্রিল আবার সশব্দে রিভলবার গর্জে উঠল নারায়ণগঞ্জ সংলগ্ন দেওভোগ গ্রামে। ব্যস, ভিলেন গার্ড বাহিনীর অধিকর্তা, এণ্ডারসন সাহেবের পোষ্যপুত্র রমজান মিয়া খতম।

বিচারে বি-ভির একনিষ্ঠ কর্মী মতি মল্লিক প্রাণ দিলেন ফাঁসি-মঞ্চে।

একমাস পূর্ণ না হতেই আবার অস্ত্র ঝঙ্কার শোনা গেল দার্জিলিং এর লেবং-ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তারিখ ছিল ১৯৩৪ সালের ৮ই মে।

এবারের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের প্রতীক স্যার জন এণ্ডারসন স্বয়ং।

ভাগ্য ক্রমে এণ্ডারসনকে অবশ্য সেবারে প্রাণ দিতে হয়নি, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে সেইদিন, সেই মুহূর্ত্তেই যে তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছিল, সেকথা'কে অস্বীকার করবে! তাই বুঝি সেদিন 'Fianna Fail' পত্রিকার মাধ্যমে আইরিশ বিপ্লবীদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ভেসে এসেছিল সুদূর আয়ল্যাণ্ড থেকে। "আমরা যা পারিনি, বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তা পেরেছেন। আন্তরিক অভিনন্দন।"

বিচারে বি-ভির আর একটি দুঃসাহসী তরুণ ভবানী ভট্টাচার্য্য প্রাণ দিলেন ফাঁসি-মঞ্চে।

দুঃখ করার কিছু নেই। এতো জানা কথাই। পৃথিবীর কোথায়, কোন শাসক সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত ভূমিকা ভুলে গিয়ে বিপ্লবী-দের ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বল? আছে কি কোথাও তার সামান্যতম নজীর? তা হলে ফাঁসির মঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে কাদের জন্য?

কিন্তু ইতিহাস। ইতিহাস কি প্রমাণ করে মীরা! শুধুমাত্র বেয়নটের জোরে কাউকে চিরকাল পদানত করে রাখা সম্ভব কি? ইংরেজের পক্ষেই কি তা সম্ভব হয়েছিল?

এসব ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে। আজ ১৯৭১ সাল। ক'দিন আগেকার কথাই বা। কিন্তু কোথায়

আজ সেই মহাশক্তিমান ইংরেজ? কোথায় তার সেই জগৎ জোড়া সাম্রাজ্য?

কিছুই অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু তার খানিকটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

মেদিনীপুরও তার ব্যক্তিক্রম নয়। চলো, নিজের চোখেই দেখবে সব। দেখার মত জিনিষ বটে। এ জিনিষ না দেখলে শহীদ তীর্থ মেদিনীপুরের আসল রূপটাই যে তোমার কাছে অজানা থেকে যাবে। চলো সেখানেই যাওয়া যাক।

আমরা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে গিয়েছি মীরা। সামনেই মেদিনীপুর চার্চ। ঐ চার্চ প্রাঙ্গণেই যেতে হবে আমাদের।

তাকিয়ে দেখো সামনের দিকে। পাশাপাশি তিনটি কবর। ব্রিটিশ দম্ভের শেষ পরিণতি পেডি, ডগলাস আর বার্জের কবর। এখানেই ওরা চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছেন বছরের পর বছর ধরে।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে।

বিনয়-বাদল-দীনেশের কথাই ধরা। রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের বীর যোদ্ধা বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর তিনদশকে।

তারপর একে একে বিশ বছর কেটে গেছে। ঐতিহাসিক সেই আনন্দে তাঁদের তিনটি প্রতিকৃতি স্থাপনের জন্য এই দীর্ঘ বিশবছর ধরে কত আবেদন, কত সাধ্য সাধনা, কিন্তু উত্তর একটাই। অর্থাৎ —'না'।

কারণ! কারণ, ওদের ইতিহাস মার খাবার ইতিহাস নয়, পালটা মার দেবার ইতিহাস। ওটা নাকি খুবই নিন্দনীয়। এহেন

ভয়ঙ্কর ছেলেদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হলে নাকি অহিংস সরকারের জাত যাবে। সুতরাং ভদ্রলোকের এককথা—'না'।

আর আজ! শুধু প্রতিকৃতি স্থাপন নয়, গোটা ডালহৌসী স্কোয়ারটারই আজ নাম হয়েছে—'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'।

একদিন কুখ্যাত এণ্ডারসনকে হত্যা করতে গিয়ে ভবানী ভট্টাচার্য্য ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আজ আলিপুরে অবস্থিত বিখ্যাত সরকারী ভবন এণ্ডারসন হাউসের নতুন নামকরণ হয়েছে—'ভবানী ভবন'।

দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেদিন যারা জীবনের জয়যাত্রার পথ রচনা করে গিয়েছেন, এতদিন আমাদের দেশেরই একশ্রেণীর শান্তিবাদী নেতৃবৃন্দের বিচারে তাঁরা ছিলেন—অপরিণামদর্শী, ভ্রান্ত যুবক মাত্র।

আজ সেই ভ্রান্ত যুবকদেরই অসংখ্য মর্মর মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছে দেশের এখানে-ওখানে-সর্বত্র।

আর মেদিনীপুরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলে সেদিন যারা সদম্ভে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, বলদর্পী সেই শাসক সম্প্রদায়ই বা আজ কোথায়?

তাঁদের স্থান হয়েছে ঐ কবরের তলায়!

একেই বলে ইতিহাস। দেয়ালের লিখন পড়তে যারা অভ্যস্থ নয়, এমনি করেই তাদের নিশ্চিহ্ন হতে হয় পৃথিবী থেকে।

ইতিহাসের নিয়ম তাই।

কিন্তু আর দেরী নয় মীরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এবার ফিরে চল আপন ঘরে।

এসো যাবার আগে আমরা প্রণাম করি এই রাঙা মাটির দেশের মাটিকে, যার প্রতিটি স্তূপের নিচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে কত নাম

না জানা মানুষ, কত চাপা কান্না, কত অশ্রু, কত চক্রান্ত, শোষণ আর কারাবাসের কাহিনী।

প্রণাম করি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামকে, অগ্নিযুগের ইতিহাসে যিনি সর্বপ্রথম ফাঁসি মঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করে নির্ভয় হতে শিখিয়েছিলেন আধমরা এই ভারতবাসীকে।

প্রণাম করি সত্যেন বসু থেকে শুরু করে দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা, নবজীবন ঘোষ, সন্তোষ বেরা প্রমুখ প্রতিটি জানা-অজানা শহীদকে, যাঁরা শুধু দিতেই এসেছিলেন পৃথিবীতে, নিতে নয়।

হে রাঙা মাটির দেশের অগণিত শহীদবৃন্দ, তোমাদের আমরা কোনদিনই ভুলবো না। তোমরা-অমর। মৃত্যুঞ্জয়ী। তোমাদের শত কোটি নমস্কার।

—০—

‘রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা’

এবার আমি পর পর চারটি মূল্যবান দলিল তোমার সামনে মেলে ধরবো মীরা।

আমাদের একান্ত অনুরোধে এই দলিলগুলি রচনা করেছেন যথাক্রমে ফণীভূষণ কুণ্ডু, বিমল দাসগুপ্ত নিরঞ্জীব রায় এবং ফণীন্দ্র কুমার দাস,—মেদিনীপুরের সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পেছনে যাদের অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

সত্যই ঐতিহাসিক দলিল। কারণ, ইতিমধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেলেও এ দলিল এর আগে কোথাও কোনদিন প্রকাশ হয়নি। সেদিক থেকে এর মূল্য সত্যই অপরিসীম। বিশেষ করে পরবর্তী কালে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবেন, তাদের কাছে এ দলিল চারটি যে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

প্রথমে শোন সংগঠনের কথা।

কি করে একদিন শহীদ দীনেশ গুপ্তের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল, তাঁর ফাঁসির হুকুম শুনে কি ভাবে সেই বিক্ষুব্ধ মেদিনীপুর সেদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল, কোথায় সে অনমণীয় চরিত্রের মূল উৎস, এ সবকিছু প্রশ্নেরই তুমি উত্তর পাবে শ্রদ্ধেয় ফণীভূষণ কুণ্ডু রচিত এই প্রথম দলিলটির মধ্যে। এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন শোন :

মেদিনীপুরে 'বি-ভি'-বিপ্লবীদের শাখা কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং উহার সংগঠন ও প্রস্তুতি-পর্ব কেমন করিয়া দানা বাঁধিয়াছিল সেই সম্পর্কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধকে মহাত্মা গান্ধী সর্বভারতের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের রূপ লইয়াছে। বাঙলায় দেশবন্ধুর আবির্ভাব সেই আন্দোলনকে

উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। দেশবন্ধুর সর্বোত্তম মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র বঙ্গের তরুণদের চিত্ত কাড়িয়া লইয়াছেন।

মেদিনীপুরও শান্ত থাকিল না। সে শান্ত থাকিবে কি করিয়া? তাহার তরুণ-রক্তে সত্যেন ক্ষুদিরামের রক্ত। তাহার ঐতিহ্যে বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ বসু-অরবিন্দের ঐতিহ্য। তাহার চক্ষুর সম্মুখে নাড়াজোল রাজ পরিবার' এবং শাসমল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অবদান। তাঁহার কল্পনায় লিখিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী!...

আমি ১৯২৫-'২৬ সালের কথা বলি।

মেদিনীপুর শহরের মহল্লায় মহল্লায় ব্যায়ামাগার গড়িয়া উঠিতে লাগিল। শহীদ সত্যেন বসুর মন্ত্রশিষ্য যোগজীবন ঘোষ (বর্তমানে স্বর্গীয়) এক্ষেত্রে অগ্রণী হইলেন। তাঁহার লাঠি ও অসি চালনার শিক্ষা মেদিনীপুরের যুব-সম্প্রদায়কে নবশক্তি ও নবচেতনা দিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র কানুনগো (স্বর্গত) শহরেরই বল্লভপুর মহল্লার চন্দ্রাকর ময়দানে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্পর্কে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার মধ্যে দেশবাসী তাঁহাকে যেন নূতন করিয়া পাইল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন না। তরুণদের শক্তিচর্চাব্রতে তিনি দ্রোণাচার্যের আশীর্বাদ দান করিলেন।

১৯২৭ সালে মেদিনীপুর শহরে যুবকদের একটি সংগঠন গড়িয়া উঠিল। উহার নাম হইল 'মেদিনীপুর যুব সংগঠন'।

উক্ত সংগঠনের প্রধান ছিলেন প্রফুল্ল ত্রিপাঠী। বর্তমানে তিনিও স্বর্গত। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। বয়সে বড় হইলেও তিনি ছিলেন আমাদের সহপাঠী। আমার অপর সহপাঠী-পরিমল রায় এবং হরিপদ ভৌমিক ও ছিলেন প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর অন্তরঙ্গ। আমরা তিনজনেই প্রফুল্ল ত্রিপাঠীকে তাঁহার কার্যে উৎসাহ, সক্রিয় সাহায্য দিতে লাগিলাম। সংগঠনের কলেবর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। কংগ্রেসের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া মদের দোকানে

পিকেটিং, বিদেশী বর্জন এবং চরকা চালান ইত্যাদি কাজেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইল।

কিন্তু এই কর্মব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকেও আমরা কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করিতেছিলাম। মন ভরিয়া উঠিতেছিল না।

ঠিক এমনই একটা সময়ে বিধাতার নির্দেশেই যেন একটি তরুণ আসিয়া ভর্তি হইলেন মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। ১৯২৭ সালে এই ছাত্রটির আবির্ভাব মেদিনীপুরের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিল। তরুণের নাম দীনেশচন্দ্র গুপ্ত। ঢাকা হইতে আসিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুরে তাঁহার দাদা তরুণ আইনজীবী জ্যোতিশ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গোপন উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। সেই ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয় রূপটি সহজেই আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল।

বাঙলাদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ। ১৯০৫ সালে ঢাকা শহরে প্রথম তিনি গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 'মুক্তি-সংঘ' নামে। সেই নাম ছিল খুবই গোপন। প্রয়োজনে একান্ত 'ইনার কোর্'-এর সভ্য ছাড়া কাহারো উহা জানিবার অধিকার হইত না। আমরাও হালে ইতিহাস ঘাঁটিতে যাইয়া এই নাম সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। এই 'মুক্তিসংঘ' তথা পরবর্তীকালের 'বি-ভি' দলেরই সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র।

দল-নেতৃত্বের নির্দেশেই দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে আসিয়াছেন বি-ভি-র একটি শাখা স্থাপন করিবার সংকল্পে।

কলেজে ঢুকিয়াই তিনি শহরের সেরা সেরা ছেলে সংগ্রহে মন দিলেন। গেলেন তিনি কংগ্রেস-আপিসে। প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর সঙ্গে আলাপ হইল। প্রফুল্লবাবু দীনেশদার প্রাণোচ্ছল রূপে আকৃষ্ট হইয়া মেদিনীপুরের তৎকালীন স্কুলের সেরা ছাত্র পরিমল রায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

আমি এবং হরিপদ ভৌমিকও প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর সহপাঠী এবং সহকর্মী। কাজেই আমাদেরও দীনেশদার কাছে ভিড়াইয়া দেওয়া হইল। অবশ্য বন্ধু পরিমলের মাধ্যমেই আমি দীনেশদাকে বিপ্লব-মন্ত্রের গুরু রূপে লাভ করি।

এই পরিমল রায় স্কুলে কৃতী ছাত্র ছিলেন বলিয়াই শহরের ভাল ছাত্রদের উপর তাঁহার কিছু প্রভাব ছিল। দীর্ঘকাল তাঁহার জেলে-জেলে কাটিয়াছে। সেই সময় যে থিসিস্ তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার উপরেই উত্তর কালে তাঁহার পি, এচ্, ডি, ডিগ্রি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।···

হরিপদ, পরিমল ও আমার মধ্যে স্কুলের সহপাঠীরূপে এবং প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের নানা কাজের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব গড়িয়াছিল অটুট ভাবে। দীনেশদার কাছে বিপ্লবমন্ত্রের দীক্ষা লাভের পর আমরা পরস্পর নব রূপে পরিচিত হইলাম, বন্ধুত্ব যেন গভীরতম খাতে প্রবাহিত হইয়া চলিল।

এবার সংগঠনের কার্য শুরু করিতে হইবে। দীনেশদার হুকুম, আদর্শ বিপ্লবী-সংগঠনে চাই স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর ও তরুণ। দীনেশদা কহিলেন: "স্কুলের একটি ভাল ছেলেকেও হাতছাড়া করিও না।"

আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম ছেলেদের কানে কানে মন্ত্র—দেশোদ্ধারের মন্ত্র-যপ করিবার অভিযানে।

ক্রমে দীনেশদার যাদুস্পর্শে অমর চট্টোপাধ্যায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (শহীদ) অনাথ পাঞ্জা (শহীদ), রামকৃষ্ণ রায় (শহীদ), প্রদ্যোৎ ভট্টাচায্য (শহীদ), যতিজীবন ঘোষ, বিমল দাসগুপ্ত, প্রভাংশু পাল, নরেন দাস, ক্ষিতিপ্রসন্ন সেন, ফণী দাস, বিনোদবিহারী সেন প্রমুখ বহু ভাল ভাল ছাত্র আমাদের দলে ভিড়িয়া গেলেন।

শুধু ভাল ছাত্র দলে দলে আসিলেই দল সংগঠিত হয় না। দীনেশদার নির্দেশ মত পরিমল, হরিপদ ও আমি সারা শহরে আমাদের দলকে কয়েকটি ইউনিট্-এ বিভক্ত করি। এক-একটি ইউনিটের সঙ্গে এক-একজনকে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হইল। ইউনিট্গুলি পরস্পর হইতে পরস্পর আলাদা থাকিয়া মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়া চলিবে। নিয়মানুবর্তিতা ও মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা হইল প্রত্যেকটি কর্মীর সর্বপ্রধান পালনীয় বস্তু। দীনেশদা এই ভাবেই বি-ভি-সংস্থার 'সেল্-সিস্টেম্' আমাদের শাখাকেন্দ্রে আমদানি করিলেন।

এই নির্দেশ পালন করিয়া মেদিনীপুরের সংস্থা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল বলিয়াই নানা বিপর্যয়ের মুখেও আমাদের সংস্থা শেষ পর্যন্ত কাজ করিতে পারিয়াছিল। একটিও স্বীকারোক্তি বা অন্যবিধ দুর্বলতার পরিচয় আমাদের বন্ধুরা করেন নাই বা দেন নাই।

অমর চট্টোপাধ্যায়, ব্রজকিশোর, ক্ষিতি সেন, নরেন দাস ও ফণীদাসকে লইয়া এক নং ইউনিট গঠিত হইল। এই ইউনিটটির উপর আমরা প্রধাণত নির্ভলশীল ছিলাম। দলের সর্ববিধ নির্দেশ এই ইউনিটের সভ্যরাই অপরাপর ইউনিটগুলির কাছে পৌছাইয়া দিতেন। অর্থাৎ এক নং ইউনিটের কর্মীদের মধ্য হইতেই এক-এক জন এক-একটি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যাঁর যাঁর নির্দ্ধারিত ইউনিটের প্রধানকে উল্লিখিত দল-নির্দেশ যথানিয়মে জানাইতেন।

দলের প্রতিটি কর্মীর শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক প্রস্তুতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। কারণ, খাঁটি মানুষ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বিপ্লবীর স্বপ্ন সফল হইতে পারে না।

দীনেশদা বলিতেন : "আমার দল-নেতাদের কাছ হইতে একটি কথাই আমি বারে বারে শুনিয়াছি যে, আমাদের 'মানুষ' হইতে হইবে। মানুষের মর্যাদাবোধ হইতেই 'জননী'র শৃঙ্খল ভাঙিবার দায়িত্ব লইতে হইবে। 'মানুষ'ই বলিতে পারে যে তাহার কাছে

অসাধ্য কিছু নাই।—তোমাদেরও, ভাই, আমি ঐ একটি -কথাই বারে বারে বলিয়া যাইব।"...

আমাদেরও তাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইল নিজে 'মানুষ' হওয়া এবং কর্মীদিগকে 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা। এখানে ফাঁকির কোন প্রশ্রয় থাকলে চলিবে না। দীনেশদার বাক্য আমাদের কাছে বিধাতার আদেশ।

শারীরিক সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন এবং শরীরচর্চা ছিল একান্ত করণীয় বস্তু। আমরা সেই জন্য শহরের নানা স্থানে ব্যায়ামাগার খুলিয়া এবং চালু ব্যায়ামাগারগুলিতে আমাদের বন্ধুবান্ধব ঢুকাইয়া কেবল শরীরচর্চা-ই সুরু করিলাম, না, ঐসব আড্ডা হইতে রিক্রুট্‌মেণ্টের সুযোগও বিস্তর গ্রহণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু 'মানসিক প্রস্তুতি'র ব্যাপারটা আরো কঠিন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিক আমাদের হইতে হইবে। আমাদের হইতে হইবে এক-একটি ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই, প্রফুল্ল চাকি, বীরেন দত্ত, চারু বসু বা গোপীনাথ।

আমাদের হইতে হইবে এক-একটি যতীন দাস, অনন্তহরি, প্রমোদরঞ্জন, বিস্‌মিল বা আসফাক্‌উল্লা! বাঘা যতীন, রাসবিহারী আমাদের ধ্রুবতারা। সেই তারা হইতে আলোকের টিপ আনিয়া আমাদের ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন আমাদের দীক্ষাগুরু দীনেশদা। আমাদের ভয় কি?

সংগঠনের প্রসারের জন্য হরিপদ ভৌমিককে পাঠান হইল কাঁথি মহকুমা-শহরে। তিনি 'কাঁথি প্রভাতকুমার' কলেজে ভর্তি হইয়া গেলেন। ওখানে কয়েক দিনের মধ্যেই হরিপদ গুছাইয়া বসিলেন। কয়েকটি ভাল ভাল ছেলেকে কর্মীরূপে তিনি পাইলেন।

পরিমল অথবা আমি মাঝে মাঝে কাঁথি যাইয়া উহাদের সঙ্গে আলাপ করিতাম। সেইসব কিশোর কর্মীদেরই অন্যতম হইলেন

ভূপাল পাণ্ডা, অনিল মাইতি, মহীতোষ বেরা, অশোক রায় প্রমুখ।

আমাদের সংগঠনের ছিল দুইটি উইঙ্গ্। একটির কাজ ছিল সংগঠন করা, অপরটির কাজ ছিল যে কোন 'কভার্ট্' বা 'ওভার্ট্' এ্যাক্টের জন্য তৈয়ার হওয়া।

সাংগঠনিক কার্যে নিযুক্ত কর্মীরা আত্মগঠনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সভ্যদের দলভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দলীয় আদর্শে ট্রেনিং দিতেন। শরীরচর্চা ও মানসিক শিক্ষাদান সমানভাবে চলিত।

আদর্শপালনে মনন-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তাঁহাদের স্কুল-কলেজের পড়া যেমন করিতে হইত, তৎসঙ্গে বাহিরের পুস্তকাদিও বিশেষ করিয়া পড়িতে হইত। আমাদের অবশ্য-পঠনীয় ছিল নানা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস—বিশেষভাবে আয়ার্লণ্ড, ইতালি, ফরাসী, রাশিয়া, তুর্কি, চীন, জাপান ও আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস।

আমরা পড়িতাম ডিভ্যালেরা, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারীবল্ডী, কামালপাশা, সান্‌ইয়েত্‌সান, লেনিন প্রমুখ মহানায়কদের জীবনী। তাহা ছাড়া গীতা, রবীন্দ্র কাব্য, স্বামীজির গ্রন্থাবলী, আনন্দমঠ, অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ, অরবিন্দের রচনাবলী, রমেশ দত্ত-বিপিনচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথ-তিলক-লাজপৎ রায়ের লেখা এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথাও আমাদের পড়িতে হইত। আরো পড়িতে হইত গান্ধীজির ইয়ং-ইণ্ডিয়া এবং জাতীয়তাবাদী দৈনিক-কাগজগুলো।

শত্রুর কাগজ ষ্টেট্‌সম্যান বা ইংলিশম্যানও আমাদের দু'একজনের প্রতি আদেশ ছিল ভাল করিয়া পড়িবার। এই পাঠচর্চা সবার গোচরেই হইত! কিন্তু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস স্পর্শ করিবার স্পৃহা আমাদের না থাকিলেও উহা হইতেও রোমাঞ্চকর এবং স্পৃহনীয় ছিল নিষিদ্ধ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা।

কলিকাতা হইতে 'পথের দাবী', 'দেশের ডাক', 'চলার পথে',

'কাকোরী-ষড়যন্ত্র' প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ গোপনে আমাদের কাছে সরবরাহ করা হইত। ঐসব গ্রন্থ আমাদের জীবন-বেদ হইয়া গিয়াছিল। নজরুল-সত্যেন দত্ত-মাইকেল-দ্বিজেন্দ্রলাল-মুকুন্দদাস প্রমুখ কবিদের দেশাত্মবোধক কবিতা গান আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত। দীনেশদার শিষ্য আমরা, রবীন্দ্রনাথের গানে এবং কবিতায় গভীর করিয়া বিপ্লবী কামনাকে খুঁজিয়া পাইতেই শিখিয়াছিলাম।

ইহা ব্যতীত আমাদের বিপ্লবীদলের মুখপত্র 'বেণু' পত্রিকার তো আমরা সকলেই আগ্রহী পাঠক ছিলাম। 'বেণু'র অপেক্ষায় একমাস থাকিতে হইত। এই অপেক্ষায় অসহ্য বোধ করিতাম। তবে সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' হইতে প্রতি সপ্তাহে আমরা বিপ্লবের খোরাক পাইতাম।

আমাদের কতগুলি ছোট ছোট পাঠাগার ছিল। মহল্লায় মহল্লায় দলের এবং বাহিরের ছেলেরা আসিয়া সেখানে বই ও পত্র-পত্রিকা পড়িত। ঐ পাঠাগারগুলিও রিক্রুটিং-সেণ্টার ছিল।

এ ছাড়া ছিল গোপন পাঠাগার। সেখানে থাকিত যত বাজেয়াপ্ত পুস্তক। দলের গোপন কর্মীদের গৃহেই সেইসব পুস্তক রাখা হইত, এবং গোপনে কর্মীরা তাহা বারেবারে পড়িতেন।

মোটের উপর আমাদের নেতারা সর্বত্রই স্কুল-কলেজের সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের উপর যেমন জোর দিতেন, তেমনি আমাদিগকে বাহিরের পুস্তকাদি পড়িতেও বাধ্য করিতেন।...

এবার দলের দ্বিতীয় উইঙ্‌টির কথা বলিব।

এই বিভাগের কর্মীদের তৈরি হইতে হইত 'কভার্ট্' বা 'ওভার্ট্' এ্যাক্টের জন্য। তাঁহাদের পক্ষে মন্ত্রগুপ্তি ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মত অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবোধে, আদর্শে নিবেদিত চিত্তে, সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্পে বুদ্ধিদীপ্ত যাঁহার বা যাঁহাদের পদধ্বনি এই কর্মীদলের সাধনক্ষেত্রে শুনা

যাইত—তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকেই দল-নেতৃত্ব সেই এ্যাক্‌শানে পাঠাইতেন যেখানে প্রয়োজন, 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'।

দল-নেতারা সাধারণত কর্মীদের টেম্পারামেণ্ট অনুসারে বিভিন্ন উইঙ্গে তাঁহাদিগকে কার্য করিবার সুযোগ দিতেন। বিপ্লবী-দলের ইহাই নিয়ম—অন্তত 'বি-ভি'-দলে আমাদের ইহাই অভিজ্ঞতা।

এই টেম্পারামেণ্ট লক্ষ্য করিয়াই দীনেশদা পরিমলকে সংগঠন-কার্যের ভার দিলেন, এবং আমাকে সুযোগ দিলেন এ্যাক্‌শান-উইঙ্গের দায়িত্ব বহন করিবার।

আমি দীনেশদার নির্দেশ মতই কর্মীদের ছোটখাট কাজের মাধ্যমে ভয়ডরহীন হইবার ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করিলাম।

শক্তিচর্চা কার্যত করা চাই। শহরের এণ্টিস্যোশাল এলিমেণ্টকে সুযোগ পাইলেই শায়েস্তা করা আমাদের একটি প্রোগ্রাম ছিল। তাহা ছাড়া কয়েকটি ছোটখাট অভিযানও চালান হইল। রাজা পঞ্চম জর্জের ছবি, প্রাক্তন ব্রিটিশ-শাসকদের চিত্র, সরকারি আপিসের ফাইলপত্র পোড়ান আমাদের অভিযানের অন্তর্গত ছিল।

ব্রিটিশ-শাসন আমরা মানি না, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে আমরা ধ্বংস করিব, ব্রিটিশ-রাজত্বের যাহা কিছু দাম্ভিকতার প্রতীক তাহাই উৎখাৎ করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম।

সর্বস্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মারপিট করিবার অভিযান ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। ফলে আমাদের ছেলেরা সাহসী ও করিৎকর্মা হইয়া উঠিলেন। ছাত্রমহলে আমাদের 'ইমেজ' আকর্ষণীয় হইয়া চলিল।

১৯২৮ সাল। দীনেশদা ইতিমধ্যে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাইয়া দিলেন 'বেণু' আপিসে।

তখন বেণু আপিস ছিল ৯৩/১ এফ্ বৈঠকখানা রোডে। ওটা ছিল পার্টির মস্ত আস্তানা। হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত, মেজর সত্য গুপ্ত, রসময় শূর প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তো ওখানে আসিতেনই, তাহা ছাড়া মফঃস্বলের কর্মী ও কর্মনেতাদেরও সংযোগস্থল ছিল ঐ বেণু কার্যালয়ই। বেণু সম্পাদক ভূপেনদা (ভূপেন রক্ষিত-রায়) ঐখানে থাকিতেন। আমরাও বরাবর কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কল্পে ঐ বেণু আপিসেই যাইতাম। এই সংযোগ-রক্ষার জন্য দীনেশদাই অবশ্য হরিপদ, পরিমল এবং আমাকে নিযুক্ত করেন।

১৯২৮ সালের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হইয়া গেল। আমাদের মতে ঐ কংগ্রেস অধিবেশনের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী" গঠন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র এবং বিপ্লবী নেতারা এই বাহিনী গঠন করিয়া বিপ্লবীদের চলার পথকে আরো অবারিত করিয়া দিলেন। এই সত্য অন্তত আমরা অনুভব করিয়াছিলাম দীনেশদা ও মেজর সত্যদার অনুগ্রহে।

১৯২৯ সাল। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী মেদিনীপুরে জিলা-যুব-সম্মেলন আহ্বান করিলেন। দীনেশদারই নির্দেশে প্রফুল্ল ত্রিপাঠী কংগ্রেস লইয়া আছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের অন্ত নাই।

ত্রিপাঠী-আহূত সম্মেলনের সভাপতি হইয়া আসিবেন সুভাষচন্দ্র। পরিমল, হরিপদ ও আমি মাতিয়া উঠিলাম। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে।

সত্যদার (মেজর) নির্দেশে ইতিপূর্বেই দীনেশদা মেদিনীপুরে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর'-এর শাখা স্থাপন করিয়াছিলেন।

দীনেশদা কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে খবর আনিলেন যে, আমাদের

ভলান্টিয়ার বাহিনী সুভাষচন্দ্র পরিদর্শন করিবেন। আমাদের ছোট-বড় প্রত্যেকটি কর্মী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন আনন্দে ও অসহ্য প্রতীক্ষায়।

কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় পরম বিস্ময়ে পরিমল ও আমি আমাদের 'বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার বাহিনী'র জি. ও. সি সুভাষচন্দ্রকে সৈনিকের পোষাকে অশ্বারূঢ় এক মুক্তিযোদ্ধা রূপে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি আমাদের সত্যদাকে মেজরের বেশে ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক রূপে।

সেই সত্যদার কাছ হইতে দীনেশদা খবর লইয়া আসিয়াছেন যে আমাদের জি. ও. সি আসিতেছেন তাঁহার বাহিনীর মেদিনীপুর-শাখা পরিদর্শন করিতে।

অসহ্য আনন্দ আমাদের। অভূতপূর্ব উদ্যম আমাদের সর্বকর্মে। দীনেশদা আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনীকে কুচকাওয়াজের তালিম দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই শিক্ষা মেজর গুপ্তের কাছেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

আমরা তৈয়ার হইতে লাগিলাম। যথাসময়ে সুভাষচন্দ্র আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন জালালুদ্দীন হাসেমি, সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দিলীপ রায়, সুবোধ বসু, শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং সুবোধবাবুর সহধর্মিনী 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী'র কর্ণেল লতিকা বসু।

সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সাথী মাননীয় নেতৃবৃন্দকে মেদিনীপুরের 'নিউ বেঙ্গল থিয়েটার হলে' অভ্যর্থনা জানালেন মেদিনীপুরেরই কংগ্রেস-নেতা কিশোরীপতি রায় ও জওহরলাল অধিকারী প্রমুখ।

যুব-সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করিয়া পরদিন সুভাষচন্দ্র আমাদের দীনেশদার সংগে চলিয়া আসিলেন নারাজোল রাজার কাছারী-বাড়িতে। সেখানে তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্‌দের গার্ড-অব্-অনার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিলেন।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়মানুবর্তিতা বোধের প্রসংগে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভাষণ তাঁহার কণ্ঠে আমরা শুনিলাম। এই সময়ে উক্ত ভলান্টিয়ার-

বাহিনীতে আমাদের গুপ্ত-সমিতির বহু সভ্য থাকিলেও মেদিনীপুর কলেজ ও স্কুলগুলি হইতে আগত ভলান্টিয়ারদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। বহিরাগত এই ছেলেদের মধ্য হইতে গুপ্ত-সমিতিতে অনেক কর্মী ক্রমশঃ রিক্রুট করা হইয়াছিল।

১৯২৯ সালেই দীনেশদা দলের নির্দেশে আবার ঢাকা চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র দুইটি পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তৃত রহিল। দীনেশদার এক পৃথিবী ঢাকা, অপর পৃথিবী মেদিনীপুর।...

দীনেশদা মাঝে মাঝে মেদিনীপুর আসিলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কলিকাতা হইতে দীনেশদার কার্যভার বহন করিবার জন্য শশাঙ্ক দাসগুপ্তকে (কমেটদা) পাঠাইলেন।

শশাঙ্কদা হিজলিতে তাঁহার ইঞ্জিনিয়ার কাকার বাড়িতে থাকিয়া মেদিনীপুর কলেজে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পরিচালনায়ই আমাদের সংস্থা চলিতে লাগিল। তাঁহার মাধ্যমেই কলিকাতার কেন্দ্রীয় 'বি-ভি'-গুপ্ত সমিতির সংগে আমাদের যোগাযোগ থাকিত এবং আমরা যথা প্রয়োজন নানা নির্দেশ পাইতাম।

১৯৩০ সাল। মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে ভারতবর্ষ আলোড়িত। তাহার ঢেউ মেদিনীপুরকেও ভাসাইয়া দিল।

কিন্তু পেডি সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজের অত্যাচার মেদিনীপুর-বাসীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। নরনারী সেই যুদ্ধে কত ত্যাগ, কত নির্যাতন, কত সাহস ও সংযম দেখাইলেন। মেদিনীপুর 'অসহযোগ আন্দোলনে'ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল।

কিন্তু মার খাইবার ইতিহাস রচনা করিতেই শুধু মেদিনীপুরের জন্ম হয় নাই, মার দিবার ইতিহাস সে পুনর্বার তাই রচনা করিতে উৎসুক।...

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল মহান্ নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হইল। বিদ্রোহীরা চট্টলার বুকে স্বাধীন ভারত-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জাতীয়-পতাকা অন্তহীন সাগরের তটভূমিতে অন্তহীন আকাশের নীচে পত্‌পত্‌ করিয়া উড়িতেছে—আমরা মানস-চক্ষে সেই ছবি দেখিলাম।...

তাহার পর আসিল ২৫শে আগষ্ট। বিপ্লবীদের তথা ভারতবর্ষের চির শত্রু টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা বর্ষিত হইল দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে। পুলিশ কমিশনার বাঁচিয়া গেলেন।

কিন্তু দীনেশবাবুর সহকর্মী অনুজা সেন হাতের বোমা ফাটিয়া উহারই আঘাতে ঘটনাস্থলে প্রাণ দিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া আমরা মনে মনে বলিলাম : শহীদের আত্মদান বৃথা যাইবে না! Failure is the pillar of success!...

ইহারই পরে আসিল ২৯শে আগষ্ট। আমাদের সতীর্থ, 'বি-ভি'-দলের কর্মী, বেংগল ভলান্টিয়ার-বাহিনীর সৈনিক—মেজর বিনয় বসু একা নিধন করিয়াছেন বাঙলার আই. জি অব্ পোলিস্ মিঃ লোম্যানকে, মারাত্মক রূপে আহত করিয়াছেন ঢাকা জিলার পুলিশ সুপার কুখ্যাত হড্‌সন সাহেবকে। ঘটনা ঘটিয়াছে দিনে দুপুরে ঢাকা মেডিকেল্ স্কুল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

বিনয়দাকে কেহ ধরিতে পারে নাই। দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের মেদিনীপুরেও যত্রতত্র বিনয়দার ছবি লাগাইয়া দিয়াছে সরকারপক্ষ।

কিন্তু এত পুরস্কারের ঘোষণা স্বত্বেও বিনয়দা পলাতক। সুপতিদার

(সুপতি রায়) অসীম চাতুর্যে বিনয়দা তাঁহারই সঙ্গী হইয়া ঢাকা হইতে পালাইয়া আসিয়াছেন। বহু পরে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়াছি।...

বিনয়দার কৃতিত্বে আমরা গর্বিত, কর্মচঞ্চল।...

পুরা তিনটি মাস কাটিয়া গেল। আসিল ৮ই ডিসেম্বর।

দম বন্ধ করিয়া কাগজের পাতায় পড়িলাম ৯ই প্রভাতে, রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর অলিন্দে এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন ধারার যুদ্ধ ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক-ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

দিনেদুপুরে ডালহৌসি স্কোয়ারে (বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে) ব্রিটিশ সরকারের শাসন দুর্গে তিনটি যুবক দুর্জয় পদভারে ঢুকিয়া ইংরেজ শাসকদের দম্ভ তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছেন। এই তিনটি যুবক আর কেহ নহেন। আমাদেরই সতীর্থ মেজর বিনয় বসুর নেতৃত্বে আমাদেরই দীনেশদা এবং ঢাকার বাদল গুপ্ত, আই. জি অব্‌ প্রিজন্স্‌কে হত্যা করিয়া সমগ্র ইয়োরোপীয় রাজপুরুষদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

বিনয়দাকে আমরা সহস্রকোটি প্রণাম জানাইলাম। শহীদ বাদল গুপ্তের উদ্দেশ্যে সংগোপনে জানাইলাম মিলিটারি স্যালুট্‌।

আর দীনেশদা? আমাদের মন্ত্রগুরু, আমাদের নায়ক, আমাদের বন্ধু ও প্রিয়তম দীনেশদা তাঁহাকে কি জানাইব?

চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সেই জল অনল হইয়া রক্তে নাচিতে লাগিল।

আমরা তৈয়ার হইয়া আছি। হুকুম আসিলেই হয়। মেদিনীপুরে বিপ্লবী বন্ধুরা আর অপেক্ষা করিতে রাজী নন। আনন্দে ও গৌরবে আমরা উদ্বুদ্ধ।

দীনেশদার আহ্বান আমরা শুনিয়াছি। তিনি যেন বলিতেছেন,

"মেদিনীপুরের কিশোর সৈনিকদল, প্রস্তুত থাক। যে কোন মুহূর্তে দল নেতৃত্ব তোমাদিকে ডাক দিবেন স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে।"...আমরা তাই প্রস্তুত।...

আমাদের প্রস্তুতি-পর্ব সর্বদিক হইতেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমরা কমেটদাকে (শশাঙ্ক দাশগুপ্ত) ক্রমাগত চাপ দিতে থাকি কেন্দ্রীয়-নেতাদের কাছ হইতে 'এ্যাক্‌শান্' করিবার অনুমতি আনিবার জন্য। আমরা বলিতে থাকি একই কথা—"কঠিন প্রত্যুত্তর আমরা কখন দিব? বিনয়দা ও বাদল গুপ্তের পথে আমরা কবে বাহির হইব? দীনেশদার আসন্ন ফাঁসির বদ্‌লা নিবার মুহূর্ত্ত কখন আসিবে?...

কমেটদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, "দ্যাখো, প্রতিহিংসা নেওয়া বা প্রত্যুত্তর দেওয়া বিপ্লবীর কার্যক্রম হয় না। বিপ্লবের নিজস্ব কার্যক্রম অনুসারে প্রোগ্রাম-অব্-এ্যাক্‌শান স্থির হয়। তোমাদের প্রস্তুতির নিখুঁত রিপোর্ট আমি কেন্দ্রে দিয়াছি। 'এ্যাক্‌শান-স্কোয়াড'-ই (কেন্দ্রীয়) জানেন কখন কি করিতে হইবে, এবং কাহাদের উপর কোন্ কাজের ভার পড়িবে। তোমরা, ভাই একটু অপেক্ষা কর।"..

অবশেষে সত্যই গ্রীণ সিগ্‌ন্যাল্ দেখিলাম। হুকুম আসিল—মেদিনীপুর এইবার শৌর্যের ইতিহাস রচনা করিবে।—

আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাস পূর্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি।...

বিপ্লব-দেবতার নয়ন-বহ্নি হইতে একটি রশ্মি অন্তরে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও সহযাত্রী যতিজীবন ঘোষ এবং

বিমল দাশগুপ্ত সেই ইতিহাস সৃষ্টি করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন।

তাঁহাদের প্রেরণা—ফাঁসির জন্য অপেক্ষ্যমান বন্দী দীনেশদা—আমাদের গুরু ও মন্ত্রদাতা ঐ নিরন্ধ্র সেলে বসিয়া আছেন ধ্যানস্তব্ধ-চিত্তে।

তিনি সেখান হইতে শুনিতেছেন যতি ও বিমলের পদধ্বনি। যতি বিমলের যাত্রা-লগ্নে বর্ষিত হইতেছে ক্ষুদিরাম, সত্যেনের আশীর্বাদ। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল তাই তাঁহাদের বুলেটে বিদ্ধ হইয়া মেদিনীপুরের নিষ্ঠুর ও কুখ্যাত আই. সি. এস্ ইংরাজ শাসক মিঃ পেডিকে জীবন দিতে হইল।...

কেহ ধরা পড়িলেন না। যতিজীবনের নাম পুলিশ কোনদিনই টের পাইল না। বিমলকে ভিলিয়ার্স-আক্রমণের পর বন্দী করিয়াও 'পেডি-হত্যা' মামলায় অভিযুক্ত করিয়া প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে হইল। কারণ, সাক্ষীর অভাবে মামলা চালাইয়া যাইবার উপায় ছিল না।...

এই যে কেহ ধরা পড়িলেন না, এই যে মেদিনীপুর হইতে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি একটি সাক্ষীও বিমলের বিরুদ্ধে যোগাড় করিতে পারিলেন না—ইহা হইতেই আমাদের প্রস্তুতি-পর্বের মান কতটা উন্নত ছিল তাহা বোঝা যাইতে পারে।...

মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক-ক্রিয়াকণ্ডের কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

শ্রীফণীন্দ্রভূষণ কুণ্ডু।

সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর।

এবার শোন শ্রদ্ধেয় বিমল দাশগুপ্তের কথা। সেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, সহকর্মী যতিজীবন ঘোষকে সংগে নিয়ে সেদিন যিনি শুধু দুর্দান্ত জেলাশাসক পেডিকেই হত্যা করেননি, কুখ্যাত ভিলিয়ার্সকেও তিন তিনটি গুলি উপহার দিয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন জন্মের মত। সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর মুখ থেকেই এবার তুমি শোন।

১৯৩০ সাল সত্যি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিক সফল যাত্রার সূচনা চিহ্নিত করে রেখেছে। এই বৎসরটিকে বলা চলে, 'The Opening of the flood gate of Revolution.' এখান থেকেই শুরু একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচণ্ডতম অভিযান, অপর দিকে অহিংস আন্দোলনের কূলপ্লাবী প্রবাহ। বিগত তেত্রিশ বৎসরের সংগ্রাম এবার তার তরঙ্গশীর্ষে উঠে গেছে।

গান্ধীজি লবন আইন' ভঙ্গ করার প্রত্যয়ে 'ডাণ্ডি' যাত্রা করলেন ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ।

ভারতের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানবার জন্য সাজসাজ রব পড়ে গেল। হাজার হাজার সংগ্রামী নরনারী কাঁথি ও তমলুকে লবন-আইন ভঙ্গ করার আগ্রহে জমায়েত হল শহর মেদিনীপুরে। নেতাদের নির্দেশ নিয়ে তারা চলে গেল যে যার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে।

শাসক-সম্প্রদায়ও চুপ করে বসে রইল না। নিরস্ত্র যোদ্ধাদের উপর চালাল অকথ্য অত্যাচার। কত লোক যে আহত হল, কত ঘর বাড়ি যে পুড়িয়ে দেওয়া হল, কত মা-বোন যে নিগৃহীতা হলেন তার সীমা-পরিসীমা রইল না।

এদিকে ১৯৩০ সালেরই ১৮ই এপ্রিল মহান বিপ্লবী-নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে শহর চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছে।...

বাঙলা দেশের বিপ্লবী 'বি-ভি' পার্টির পরিচয় আজ কারো অজ্ঞাত নেই। সেই 'বি-ভি'-রই একটি শাখা পত্তন করেছিলেন দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুর শহরে, কেন্দ্রের নির্দেশ মত, ১৯২৭ সালে।

তখন তিনি মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র; ঢাকা থেকে চলে এসেছেন নাকি পড়াশুনায় অধিকতর মন বসানর বাসনায়!...

আমরা দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য। তাঁরই ডাইরেক্ট-নেতৃত্বে বিপ্লবের পদধ্বনি শুন্‌ছি।

মেদিনীপুরে একটি সুগঠিত দল গড়ে দীনেশদা আবার চলে গেলেন ঢাকা। বারে বারে আসতেন তিনি মেদিনীপুর।

তবে আমাদের পরিচালনার ভার কলকাতার কেন্দ্রীয় সংস্থা-ই গ্রহণ করেছিল দীনেশদা চলে যাবার পর থেকে। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতেন শুধু পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু ও হরিপদ ভৌমিক। এটা ১৯২৮-৩০ সালের কথা।

দেশে—বিশেষ করে সারা মেদিনীপুরে—অসহযোগ তথা 'আইন অমান্য আন্দোলন' যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের নেতা দীনেশ গুপ্ত আমাদের গোপনে ডেকে পাঠালেন।

তিনি বললেন, "তোমরা এ আন্দোলনে অংশ নেবে। তা না করলে সংগ্রামী-জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই সুযোগে তোমরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে আপন করে নেবে, তাদের দুঃখের ভাগীদার হবে।"

আমাদের মধ্য থেকে এক অংশকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে হল। সেখানে ফাঁকি কিছু ছিল না।

স্কুল-কলেজের ধর্মঘটের সময় পেডিসাহেব (জিলা ম্যাজিস্ট্রেট) ছাত্রদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার করে যেতেন, তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে নিপীড়িত ছেলেদের সহায়তা করতাম, সাহস দিতাম। ফলে সাধারণ ছেলেদের উপর আমাদের প্রভাব বেড়ে যেত।

দীনেশদা তিনটি বিষয়ে বিশেষ করে অবহিত থাকার নির্দেশ

আমাদের দিয়েছিলেন। বিপ্লব-বাহিনীর সৈনিক রূপে আমাদের তাই উক্ত তিনটি বস্তুর প্রতি নজর রাখতে হত।

যথা—(ক) ক্যামোফ্লাজ, (খ) অনারেবল্ রিট্রিট্, (গ) চুজিং দ্যা টাইম্ ফর্ ফাইন্যাল্ স্ট্রাইক্।

আমরা তাই তাঁরই আদেশে খদ্দর পরে পুলিশের কাছে গান্ধীপন্থী সেজে থাকতাম। জনসাধারণকে সংগ্রামী-আদর্শে যথাসম্ভব অনুপ্রাণিত করে সংঘবদ্ধ ভাবে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের মধ্যে দু' একজন তাদের সঙ্গী হতেন।

আমরা সাধারণত পেছনে থেকে সংগঠন করতাম, এগিয়ে যেতাম না। এই ভাবে পেছনে অবস্থান করেই মাস্-কণ্টাক্ট্ আমাদের যতটুকু হত, তার সাহায্যে ভাবী সশস্ত্র-সংগ্রামের পটভূমি রচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। কংগ্রেস-আন্দোলনে আমাদের তরফ থেকে প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর অবদান সামান্য নয়।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ইতিহাসের একটি পরম লগ্ন। চট্টলার তরুণদল সশস্ত্র-যুদ্ধে ব্রিটিশ-শাসনকে পর্যুদস্ত করে দু'টি অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ঘোষিত হয়েছে এক 'স্বাধীন' সরকার।

চার দিন পর (২৩শে এপ্রিল) জালালাবাদ পাহাড়শীর্ষে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন বারজন তরুণ বীর। কালারপোল ও সদরঘাটের সম্মুখ সংঘর্ষে বহু বীরের রক্তে চট্টলার মাটি রঞ্জিত হল। কত বালক-কিশোর-যুবা 'শহীদে'র মুকুট মাথায় পরে ভারতমাতার পদতলে শোণিতার্ঘ্য দান করলেন।

এদিকে 'আইন অমান্য আন্দোলন'-ও তৎকালে পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের অত্যাচার রূপ নিচ্ছে ভয়ঙ্কর ও বীভৎস।

বিপ্লবীরা স্থির করলেন যে শুধু মার খাবার ইতিহাস সৃষ্টি করে জনগণ বেশিদূর এগুতে পারবে না, তাদের কাছে মার দেবার ইতিহাস

তুলে ধরতে হবে। পুলিশের নগ্ন রূপ তাতে প্রকটতর হোক, জনগণ তাতে প্রত্যয় ফিরে পাবে। বাঙলার তরুণদল আপন শৌর্যে প্রতিষ্ঠিত হোক।...

পুলিশের সর্বময়-কর্ত্তা ইন্সপেক্টর-জেনারেল সাহেব। তাই একদিন শুনলাম, আমাদেরই সতীর্থ মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু ঢাকা শহরে মিঃ লোম্যান্‌কে নিধন করেছেন, ঢাকার পুলিশ-সুপার তৎসঙ্গে মারাত্মক ভাবে ঘায়েল হয়েছেন বিনয়দা'রই হাতে।

সেই স্বর্ণ-আক্ষরিত দিনটি ছিল ১৯৩০ সালেরই ২৯শে আগস্ট।

জনাকীর্ণ ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে দিনেদুপুরে একা বিনয় বসু বীর্যবত্তার যে স্বাক্ষর সেদিন লিখে গেলেন, তাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হলাম। এই সাফল্য আমাদের অদম্য শক্তি দান করল।

তারপর এল ৮ই ডিসেম্বর। ১৯৩০ সালের এই দিনটি ব্রিটিশ-শাসনকালের এক অবিস্মরণীয় দিন।

সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজের রক্তক্ষরা ক্ষত শুকোতে না-শুকোতেই আমরা আবার শুনলাম, তিনটি বিপ্লবীর 'রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌ অলিন্দ-যুদ্ধে'র রোমাঞ্চকর কাহিনী। মেজর বিনয় বসুরই নেতৃত্বে আমাদের দীনেশদা ও বাদলদা শৌর্যের এক অতুল কীর্তি স্থাপন করেছেন।

আমাদের গর্বের সীমা নেই। আমাদের রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে। 'সর্বনাশের নেশা'য় আমরা মত্ত হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, গুরু দীনেশ গুপ্তের আমরা যোগ্য শিষ্যত্বের পরিচয় অনায়াসেই দিতে পারব। আমরা বিশ্বজয়ের অধিকারী।...

আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। দীনেশদার অসমাপ্ত কাজ আমাদের ত্বরায় সম্পন্ন করতে হবে। আমরা অধীর। আমরা ক্রমাগত দাদাদের উপর চাপ দিতে লাগলাম। মেদিনীপুরের সংগঠন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে, এবার আমাদের প্রচণ্ড কোন য়্যাক্‌শানের সুযোগ দেওয়া হোক! আমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে ছিল একটি কথা: Death before Dishonour. Do and face Death.

১৯৩১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

নির্জন কাঁসাই নদীর তীরে এক গোপন স্থানে, মেদিনীপুর-সংস্থায় দীনেশদার স্থলাভিসিক্ত কর্মনেতা শশাঙ্ক দাসগুপ্ত, ফণীকুণ্ডু, জ্যোতিজীবন ঘোষ এবং আমি আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, মেদিনীপুর জিলায় অত্যাচারের প্রতিমূর্তি এবং মাতৃজাতির সম্ভ্রম লুণ্ঠন করার মালিক ঐ জিলা-শাসক পেডিসাহেবকে চরম দণ্ড দান করতে হবে। আই-সি-এস গোষ্ঠীর জাঁদরেল প্রতিনিধি এই ব্যক্তি। এ-ব্যক্তির চরম দণ্ড শুধু বিপ্লবীদের নয়, মেদিনীপুরবাসী প্রত্যেকটি নরনারীর কাছেই ছিল একান্ত কামনার বস্তু।

স্থির হল, পরের দিন ফণীদা ও আমি ডাউন্ পুরুলিয়া ট্রেনে খড়গপুরে যাব, কারণ কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন সেন আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপ্ পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে খড়গপুরে আসবেন। তাঁর কাছ থেকে মালপত্র নিয়ে ঐ আপ্ পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারেই ফিরে আসব আমরা এবং মনোরঞ্জনদা ডাউন্ পুরুলিয়াতেই কলকাতা প্রত্যাবর্তন করবেন। কার্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হল। আই-বি'র পিতৃপুরুষও জানতে পারল না কোথা দিয়ে কি হল, এবং এই ঘটনার পরিণতি কতদূর! অবশ্য আমাদের প্রত্যেকটি ম্যুভ্‌মেন্টই কলকাতা 'বি-ভি'-কেন্দ্রের পরিচালনায় সংঘটিত হচ্ছিল। শশাঙ্কদা (কমেটদা) কেন্দ্রীয়-সংস্থারই নিযুক্ত কর্মনেতারূপে মেদিনীপুরে অবস্থান করছিলেন।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩১ সাল। পেডি সাহেব তাঁর অনুগত রাজপুরুষ ও ভক্তদের সহ জেলা-বোর্ডের সভা করবেন বেলা ১টায়।

আমন্ত্রণ পৌঁছে গেছে সবার কাছে। আলোচ্য বিষয়, অহিংস-আন্দোলনকে কি করে বানচাল করা যায়।

শুধু তাই নয়। আরো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, যেকোন উপায়ে বিপ্লবীদের নির্মূল করা প্রয়োজন। সেজন্য চাই রাজভক্তদের অকৃত্রিম সাহায্য।

কলম, ঘড়ি প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে তাদেরকেই, যারা এই সৎকর্মের সহায়ক হবে। হুজুরের দয়ায় রাজভক্তরা এমনিতেই বিগলিত।

কিন্তু এত প্রাপ্তির সংবাদেও বুকের কাঁপুনি থামে না। সারা বাঙলায় যে তাণ্ডব চলেছে ঐ বিপ্লবীদের, তার মধ্যে আবার ঐ দস্যুদের নিয়েই কথাবার্তা কেন ?

কোথা থেকে কি শুনে কে এসে প্রাণটা কেড়ে নেবে তার কি কোন স্থিরতা আছে ? তাই ভক্তদের অভয় দেবার জন্যই দয়াময় পেডি সাহেব সভার সময়টা গোপনে এগিয়ে আনলেন বেলা ১০ টায়।...

এদিকে যতিজীবন ও আমি প্রস্তুত হয়ে ১টার পূর্বেই জেলা বোর্ডে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ততক্ষণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে পেডিসাহেব তাঁর বাঙলোর পথে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় হাঁটা দিয়েছেন। আমরা ফিরে এলাম। পেডি সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

এ ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় সংস্থার ভাল লাগে নি। তাই য়্যাক্‌শান্ স্কোয়াডের অন্যতম সভ্য প্রফুল্ল দত্ত মহাশয় (আমাদের ফুলদা) সরেজমিনে ব্যাপারটা বুঝবার জন্য কলকাতা থেকে মেদিনীপুর এলেন ২৫শে মার্চ।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ—কাজ মেদিনীপুরে হবেই, তবে নিখুঁত ভাবে সমস্ত খবর নিয়ে এগুতে হবে। কোনক্রমেই ব্যর্থতা 'বি-ভি' বরদাস্ত করতে পারে না। হোক দেরি—কিন্তু সাফল্যে সুন্দর করতে

হবে যেকোন য়্যাক্‌শান। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি রেখে দুঃসাহস দেখানর নাম হঠকারিতা।…

এদিকে পেডি সাহেবও কিছুটা দু'মুখো নীতি গ্রহণ করেছেন।

একদিকে সত্যাগ্রহীদের—নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে—ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করছেন; অপর দিকে ছাত্রদের পিঠ চাপড়িয়ে স্ববশে আনবার ব্যবস্থায় চেষ্টিত হচ্ছেন।

মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে তাই একটি ছাত্র-প্রদর্শনী করার আয়োজন করলেন তিনি ১লা এপ্রিল থেকে। এ-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে নানাভাবে ছেলেদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও ঘোষণা করা হল। কিন্তু সে পুরস্কার স্বহস্তে বিতরণ করার সৌভাগ্য তাঁর আর হল না।…

২৫ শে মার্চ। সন্ধ্যা ৭টা। প্রফুল্লদা (ফুলদা), ফণীদা (কুণ্ডু), যতিজীবন, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও আমি স্টেশনের কাছে নির্জন মাঠে মিলিত হয়েছি।

ফুলদার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর। তিনি আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন কেমন মন ও প্রত্যয় নিয়ে কি ভাবে প্রস্তুতিপর্ব নিখুঁত উপায়ে সম্পন্ন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্রস্তুতিপর্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকলে য়্যাক্‌শানের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে যায়।

তিনি বললেন যে, ইংরেজ হল চতুর শাসক। ওরা দেশীয় লোকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা আড়ালে থেকে নেটিভ্‌দের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়। আমরা টেনে-টেনে ঐ রক্তখেকো ইংরেজ-শাসকদের হত্যা করব।…

সেই সন্ধ্যায় স্থির হল যে, ১লা এপ্রিল যতিজীবন ও আমি

যথাসময়ে 'প্রদর্শনী' দেখতে যাব, এবং পেডিসাহেব প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলি করব। আমাদের থাকতে হবে যতটা সম্ভব সাহেবের কাছাকাছি।

কিন্তু এবারও নিরাশ হ'লাম। পেডি এলেন না। প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন একজন এ. ডি. এম্!······

১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল। বিপ্লবের ইতিহাসে একটি অগ্নিক্ষরা দিন। রাজনীতিক দিক থেকে এই দিনটির তাৎপর্য প্রচুর।

সকাল থেকেই ছাত্রের দল খুবই কর্মব্যস্ত। কারণ আজই প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি, আজ হয়তো পেডিসাহেব একবার আসতেও বা পারেন।

আমার কাকা হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয় তখন কলিজ্ঞিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক। সেদিন সকাল থেকেই আমি কাকাবাবুকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করছিলাম: "পুরস্কার দেবার কথা ছিল, তার কি হল? আমার বোন একটা সেলাইয়ের কাজ দিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে? আজকে কিছু একটা না পেলে তার কান্না থামান যাবে না।"

এসব সত্য-মিথ্যা নানা কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম যে-মতলবে, তা সিদ্ধ হল। কাকাবাবু হঠাৎ উত্তর দিলেন: 'পেডিসাহেবের তো আজ প্রদর্শনীতে আসবার কথা—দেখি কি হয়।'···

আমি আহ্লাদিত চিত্তে ছুটে গেলাম আমার সহপাঠী শক্তি সরকারের কাছে। শক্তি তখন কুখ্যাত এস্. ডি. ও. শঙ্কর সেনের পুত্রের গৃহ-শিক্ষক। তাঁর কাছে শুনলাম যে শঙ্কর সেন আজ শহরে ফিরে আসছেন। ডি. এম্; এস. ডি. ও; এ. এস্. পি—এঁরা একত্রে শিকারে গিয়েছিলেন। সুতরাং সবাই একত্রেই ফিরবেন ধরে নেওয়া যায়।···

তখন বিকেল ৫টা। আমরা প্যারেড্ নিয়ে ব্যস্ত। প্যারেড্ করতাম ডি. এম্-এর বাঙ্লোর বরাবর ডায়মণ্ড-গ্রাউণ্ডে। আমাদের লক্ষ্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাঙ্লোর পানে।

হঠাৎ দেখলাম সাহেব স্বয়ং (মিঃ পেডি), হীরালালবাবু, সুবোধবাবু, নারায়ণবাবু, অশ্বিনীবাবু, মৌলভীসাহেব ও অপর একজন, সাহেব বাঙ্লো থেকে বেরিয়ে আসছেন।

আমরা দু'জন—অর্থাৎ আমি ও যতিজীবন—তৎক্ষণাত প্যারেড্ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

যতি চলে গেলে আমিও ঘরে এসে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে ভাল করে জামাকাপড় পরে অপেক্ষা করছি, এমন সময় যতিও ঘর থেকে তৈয়ের হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে এল। কাজের জন্য অস্ত্রগুলো তোলা ছিল আমারই ঘরে। আমরা তাড়াতাড়ি যে-যার অস্ত্র পেটের খাঁজে গুঁজে নিয়ে স্কুলের দিকে রওনা হলাম।

স্কুলে এসে দেখলাম, পেডিসাহেব নিবিষ্টমনে প্রদর্শনী দেখছেন। আমরা সলক্ষে পেডির নিকটবর্তী হয়ে গুলি চালালাম।

আমাদের চোখে তখন আগুন। দু'চোখ মেলে আমরা দেখলাম, আমাদের সম্ভ্রমহারা লাঞ্ছিতা মা-বোনেদের অভিশাপ আগুনের হল্কা হয়ে যেন আহত পেডিকে দগ্ধে মারছে!—পেডি কেঁপে কেঁপে গা মোড়াচ্ছিলেন। মুহূর্তে পড়ে গেলেন পাশের বেঞ্চের উপর।

আমাদের বুলেট খতম হয়ে গেছে। আমরা তৈয়ের হচ্ছি সায়ানাইড্-ভরা এ্যাম্পুল্ চিবানর জন্য। একবার তাকালাম চতুর্দিকে। কি আশ্চর্য! ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নেই—সব ফাঁকা। বীরপুঙ্গবরা যে-যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, আমাদের বাধা দেবার জন্য কেউ নেই!

আমরা নিরাপদে বেরিয়ে এলাম। ঠিক করলাম, সাইকেল-এ বাঁকুড়া চলে যাব।

এমন সময় দেখলাম একটি লোক সাইকেলে আমাদের দিকে আসছে। আমরা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর। বেচারীর সাইকেলটি আত্মসাৎ করার পর দেখলাম যে মানুষটি আমাদের খুবই পরিচিত। নাম তার ফণীভূষণ মুখার্জি—ছাত্রদের 'ধঞ্চিদা'। তিনি মেদিনীপুর হিন্দুস্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। স্কুল ছাড়ার পরও আমাদের মাঠেই খেলতে আসতেন।

আমাদের খুব ভয় ছিল যে, ধঞ্চিদা না পুলিশকে কিছু জানিয়ে দেন। কারণ, তাঁর তো কোন পলিটিক্যাল্ ট্রেনিং ছিল না! কিন্তু তাঁর কাছে পেলাম কি অপূর্ব সহযোগিতা! আমাদের সাইকেলে উঠে চলে যাবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে তিনি রাত বারটার সময় থানায় গিয়ে এক মিথ্যা বিবরণ সহ এজাহার দিলেন। আমাদের কথা তিনি বেমালুম চেপে গেলেন। তৎসত্ত্বেও লাঞ্ছনা তাঁকে যথেষ্ট সইতে হয়েছিল। তবু বীরের মত তিনি তাঁর ভূমিকায় অটল ছিলেন।

পরে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে পেডি-হত্যা-মামলায় আমার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হতে ধঞ্চিদাকে আনা হয়েছিল আমাকে সনাক্ত করার জন্য।

ধঞ্চিদা আমাকে খুবই চিনেছিলেন, কিন্তু আমার দিকে মোটেই তাকাচ্ছিলেন না। তাঁর ভয়, চোখোচোখি হতেই যদি তিনি হেসে ফেলেন!

বিচারক কটাক্ষ করে বললেন: "আপনিতো মশাই চেনার চেয়ে না-চিনতেই বেশি ব্যস্ত! ভাল করে দেখুন।"

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ধঞ্চিদা—শ্রীফণীভূষণ মুখার্জি—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিতে স্থির সংকল্প। তাঁকে টলাবে কোন পুলিশ বা কোন ম্যাজিস্ট্রেট?…

পূর্ব কথায় ফিরে আসি। সাইকেলে চেপেছি। তখন সন্ধ্যা ৭টা। দ্রুত বাঁকুড়ার পথে ছুটে চলেছি।

কিন্তু সাইকেলটা এত জীর্ণ যে ছ'জনকে বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা' ছাড়া রাস্তা জুড়ে জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকল্পে কাজ হচ্ছিল। সেই জন্য মাঝেমাঝে মাটির স্তূপ; বেশ উঁচুনীচু পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বিপদে পড়ছিলাম।

যতি আমার চেয়ে একটু বেঁটে। তাই আমাকে নিয়ে সাইকেল চালাতে তাঁর অসুবিধে হল। রাত ১০টার মধ্যে আমরা মাত্র ১৪ মাইল এগিয়ে এসেছি! বাঁকুড়া যাওয়ার চেষ্টা অবান্তর।

রাত ১১টায় এসে গেল 'আপ্ পুরুলিয়া ট্রেন' শালবনী স্টেশনে। আমরা ঝোপের মধ্যে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে দু'খানা বিভিন্ন স্টেশনের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লাম। পুরুলিয়ায় পৌঁছলাম বেলা ৯টায়।

স্টেশনেই আমরা আমাদের পোষাক বদলালাম, কারণ মেদিনীপুরে অনেকেই আমাদের চিনতে পেরেছিল। কিন্তু একটি মানুষও এগিয়ে আসেনি পুলিশকে সাহায্য করতে।

মেদিনীপুরে প্রত্যেকটি মানুষ এই দুর্দান্ত শাসকের অত্যাচারে এতই বিক্ষুব্ধ ছিল যে, তারা মনে করেছিল আমাদের হাত দিয়ে তারাই যেন এই কাজটি সম্পন্ন করেছে।

তখন আমাদের মনে হত দীনেশদার কথা। বলতেন তিনি: "গণ-আন্দোলনের শরিক হও, তবেই তোমরা তাঁদের লোক হবে, তোমাদের কাজ তাদেরই কাজ হবে।"...

৮ই এপ্রিল রাত আটটায় আমরা কলকাতা এসে পৌঁছলাম। উঠলাম এসে আমাদেরই সতীর্থ শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর মিষ্টির দোকানে। দোকানটি অবস্থিত ছিল শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সার্কুলার রোড্-কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ে।

শৈলেন কুণ্ডু মেদিনীপুরেরই ছেলে। ঘটনা শুনে আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গেসঙ্গে দোকানের কর্মচারীদের তিনি ছুটি দিয়ে

দোকানের দরজা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর গোগ্রাসে প্রচুর খাবার গিলতে গিলতে তিনটি বন্ধুতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললাম।

ঠিক হল, শৈলেন আমাদের একটি রেসিডেন্সিয়াল্ হোটেলে তুলে দিয়ে চলে যাবেন মেদিনীপুর—তাঁর কাকার (ফণী কুণ্ডু মহাশয়) কাছে, আমাদের সংবাদ নিয়ে।

কিন্তু শৈলেন মেদিনীপুর পৌঁছে জানলেন যে ফণীদা আমাদেরই খোঁজে কলকাতায় চলে এসেছেন। পুলিশ আমাদের বন্ধুদের বাড়ি-ঘরে ওয়াচার বসিয়েছে। কাজেই শৈলেন কারো সঙ্গে দেখা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে ১০ই তারিখ কলকাতার দিকে রওনা হলেন। স্টেশনে যে-গাড়ী ঢুকেছে সেটাই কলকাতায় ফিরে যাবে। শৈলেন গাড়িতে উঠবার কালে দেখলেন যে তাঁর কাকা—আমাদের ফণীদা —ঐ গাড়ি থেকেই নামছেন। ফণীদা কলকাতার একটি ঠিকানা দিলেন। ঐ ঠিকানায় গেলেই কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

শৈলেন কলকাতা আসতেই তাঁর সঙ্গে যতি ও আমি চলে গেলাম ঠিকানা মত মনোরঞ্জন সেনের গৃহে।

তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি। পরে খড়গপুরে অস্ত্র সরবরাহের ঘটনা উল্লেখ করতেই তিনি অস্ত্রগুলো দেখতে চাইলেন। অস্ত্র দেখান হল। মনোরঞ্জনদা অনায়াসে ওগুলো সনাক্ত করলেন।

অনতিবিলম্বে তিনি আমাদের নিয়ে (অস্ত্রাদি সহ) পার্কস্ট্রিট-শেল্টারে (যেখানে দীনেশদা ও বাদলদা পলাতক অবস্থায় ছিলেন) চলে এসে য়্যাক্‌শান্-স্কোয়াডের দাদাদের জানালেন আমাদের আগমন বার্তা।

দাদারা উদ্বেগ-চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের সংবাদের জন্য। আমাদের কাছে পেয়ে কী তাঁদের আনন্দ!···

পার্কস্ট্রিট-শেল্টারে তখন উপস্থিত ছিলেন য়্যাক্‌শান্-স্কোয়াডের ফুলদা (প্রফুল্ল দা), রসময়দা, নিকুঞ্জদা এবং সুপতিদা। মেজদা

(হরিদাস দত্ত) তখন সেখানে ছিলেন না বলেই আমার ধারণা। সবাই অকুণ্ঠ আবেগে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অত্যধিক উৎফুল্ল ছিলেন প্রফুল্লদা। কারণ, তিনি ছিলেন বিশেষ করে মেদিনীপুর-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত দাদা। তাই এ জয় যেন তাঁরই জয়।··

অতঃপর রসময়দা ও নিকুঞ্জদা যতি ও আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমাদের কত সিনিয়র এই দাদারা—কিন্তু বয়স ও পজিশনের ব্যবধান কোথাও নেই! এঁরা শুধু 'দাদা' নন, 'নেতা' নন—এঁরা আমাদের বন্ধু, একান্ততম বন্ধু!···সিনেমা দেখা সাঙ্গ হলে যতিকে নিয়ে গেলেন রসময়দা এক শেল্টারে—তার হদিস আমার জানা নেই, জানবার কথা-ও নয়।

নিকুঞ্জদা আমাকে নিয়ে চলে এলেন মেটিয়াবুরুজে রাজেনদার শেল্টারে। এই সেই শেল্টার, যেখানে শহীদ বিনয় বসু তিন মাস কাল থেকে গেছেন। এই সেই শেল্টার, যেখান থেকে বিনয় বসু 'অলিন্দ-যুদ্ধ' পরিচালনার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দিকে যাত্রা করেছিলেন।···

বর্ষীয়ান রাজেন্দ্রকুমার গুহ আমার পিতৃতুল্য। অমন নিষ্কাম এবং নির্ভীক বিপ্লবী আমি এই প্রথম দেখলাম। যে সংসার করেনি, সে সন্ন্যাসী হতে পারে।

কিন্তু সংসার আবর্তে বসেও যে টলে না, তার তুলনা কোথায়?

রাজেনদার নিঃস্বার্থ কার্যকলাপ ও অনমনীয় চরিত্র এবং অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতা-জ্ঞান আমার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। তাই ভিলিয়ার্স আক্রমণের পর বন্দী অবস্থায় লালবাজারের লক্-আপে দিনের পর দিন যে নির্যাতন ভোগ করেছিলাম তা' ভ্রুক্ষেপ না করে কঠিন চিত্তে যে নিজেকে এবং সংস্থাকে বাঁচাতে পেরেছিলাম—তার মূলে ঐ রাজেনদা। সকল নির্যাতনের মধ্যে

আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দান করত দুইটি লোকের চরিত্র। একটি রাজেনদার, অপরটি আমার পিতার।...

পেডি নিহত হলেন। বিপ্লবীরা নিখোঁজ। সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ ধূলায় লুণ্ঠিত। কলকাতা থেকে বড় বড় আই. বি অফিসারবৃন্দ মেদিনীপুরের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু কোন সূত্রই তাদের হস্তগত হল না।

তখন তারা আন্দাজে পূর্ববঙ্গীয় মেদিনীপুরবাসীদের বাড়ি সার্চ করা শুরু করল। ফলে আমাকে খোঁজ করল, কারণ আমার আদিবাস বরিশাল জিলায়। আমি অনুপস্থিত।

যতিজীবনের খোঁজ হল না, কারণ সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। ব্রিটিশের 'divide and rule'-এর বুদ্ধি। তারা জানে না যে বিপ্লবীর জাত নেই, ধর্ম নেই, পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই, প্রদেশ-প্রদেশান্তর নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা ভারতীয়, তারা বিপ্লবী, তারা দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক।...

আমাদের নেতারাই যতির দাদা বিনয়জীবন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যতিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গৃহে, মেদিনীপুরে। যতি সুন্দর ভাবে সবার অলক্ষ্যে থেকে গেলেন।

যতির খোঁজ কোনভাবেই পুলিশ করল না। ফলে দাদারা একটু ভুল বুঝলেন। রসময়দা আমাকে বললেন : "পুলিশ দেখছি কিছুই বোঝেনি। তুমি শুধুই পলাতক হয়ে থাকবে কেন ? মেদিনীপুর ফিরে গিয়ে সংগঠনের কাজ কর।" ঠিক হল, আমি আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে মেদিনীপুর ফিরে আসব।

১৬ই এপ্রিল ভোর পাঁচটায় বড়দাদার সঙ্গে আমি মেদিনীপুরের বাড়িতে এলাম। আমার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেতেই বাবা উঠে এসে আমাকে অন্দরে নিয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে বারেবারে একই প্রশ্ন : "তুই এলি কেন ? পুলিশ যে সব আঁচ করেছে।"

বললাম: "কাগজে তো কিছুই বের হয়নি?" উত্তরে তিনি বললেন: "তুই আসবি আশা করেই ওরা খবর চেপে রেখেছে, ওরা রোজ খবর করে তুই এলি কিনা। এবেলা-ওবেলা রোজ খবর করে। ওদের ফাঁদে তুই অজান্তে পা দিয়েছিস।"

পিতাপুত্রে এই কথা হতে না হতেই সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বাবা বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম তাঁর নার্ভ কত শক্ত! পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর হাজির। আমার অস্পষ্ট সংবাদ পেয়েই সে এসেছে।

আমাদের বাড়ির পাশে ছিল এক রায়সাহেবের বাড়ি। খবরা-খবরের অসুবিধা তাই 'আই-বি'দের নেই।

দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল: "আপনার ছেলেকে একবার ডাকুন তো? আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব।"

বাবা বড়দাকে ডেকে পাঠালেন। বড়দা ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন: "এই আমার বড় ছেলে। নাম বিজয়। এক্ষুনি কলকাতা থেকে এসেছে। সেখানে ডাক্তারি পড়ে। বিমলের খোঁজ করার জন্যই ওকে খবর দিয়ে আনিয়েছি।"

দারোগা হতবাক। অমন সহজ, সরল, অকম্পিত কণ্ঠে কোন ফাঁকির স্পর্শটুকু দারোগা খুঁজে পেল না। বড়দাকে দু'একটি প্রশ্ন করে দারোগা বিদায় হল। আমি ঘরে বসে বাবার সব কথা শুনলাম। অমন সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি বাবাকে কে জোগাল!...

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার বাবা যেন অন্য ধাতুর গড়া মানুষটি হয়ে গেলেন। এ-বাবা আমাদের অপরিচিত। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই—আছে শুধু কর্তব্যবোধ এবং অগাধ দেশপ্রেম। কি করে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের কল্যাণের জন্য বাঁচান যায় তারই সংকল্প তাঁর সর্বাঙ্গে।

দারোগা চলে গেলে তিনি অন্দরে ফিরে এলেন। মেজদাকে আদেশ করলেন প্রখ্যাত শহীদ সত্যেন বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন বসুর (কেতন বসু) সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তারপর তিনি আমার কাছটি ঘেঁসে বসলেন। বললেন: "তুমি যা করেছ তা বিচারের ঊর্ধে। কতটা সাহস ও সাধনা থাকলে যে একাজ করা যায় তা আমি বুঝি। তুমি যা করেছ তার ফলাফল কি হতে পারে বা হতে পারত তা তোমার অজ্ঞাত নয়। তোমাকে বলার মত আমার কিছুই নেই। তবু এইটুকু তোমাকে অনুরোধ করব যে, তুমি যদি জীবিত ধরা পড়, তাহলে এমন কিছু কোরো না যাতে বন্ধুদের কোন ক্ষতি হয়। আমি আশীর্বাদ করি এই গুরু দায়িত্ব বহন করার শক্তি যেন ভগবান তোমাকে দেন।"

নিঃস্বার্থ পিতার আশীর্বাদ বোধ হয় বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী। নইলে মদ্যপ, হিংস্র, জানোয়ার স্বরূপ ইংরেজ সার্জেন্টগুলো লালবাজার লক্-আপে দিনের পর দিন যখন ক্রমান্বয়ে ছ'সাত ঘণ্টা ধরে বেত্রাঘাতে আমার সর্বদেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল—অথবা তাদের চড়, ঘুসি, লাথি খেতে খেতে এবং তৎসঙ্গে 'আই-বি'র মণি বোসের অশ্লীল গালাগালি শুনতে শুনতে আমি যখন চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম তখন কোথা থেকে আমার শক্তি আসতো দীনেশদার আদর্শকে পালন করবার? এই শক্তি দিয়েছিলেন আমার পিতা অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত এবং পিতৃতুল্য আমার বিপ্লবী-দাদা রাজেন্দ্রকুমার গুহ।···

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজদা (বিনয় দাশগুপ্ত) কেতনবাবুর কাছ থেকে ফিরে এলেন। কেতনবাবু অর্থাৎ ভূপেন বসু তাঁদের পরিবারের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য রক্ষা করে সর্ববিধ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরক্ষণেই আমাদের বাড়িতে তাঁর কাছ থেকে এল একটি হিন্দুস্থানী গয়লা। নাম তার রঘুনন্দন গোপ। শহীদ সত্যেন বসুর

আদর্শে সে বহুদিন থেকেই অনুপ্রাণিত। আমাদের বিপদের বার্তা পেয়েই সে বলল: "আমার জান কবুল, আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবো।"

মেজদা তাকে বললেন: "আমাদের বাড়ি যেকোন মুহূর্তে সার্চ হতে পারে। তুমি তোমার ব্যবস্থা কর। আমরা ততক্ষণ ওকে লাইব্রেরিঘরে সরিয়ে রাখব।"

আমার মেজদা তৎকালে লাইব্রেরি অর্থাৎ 'ঋষি রাজনারায়ণ বসু পাঠাগারে'র লাইব্রেরিয়ান্। আমি তৎক্ষণাৎ খাওয়াদাওয়া সেরে ছদ্মবেশে ঘরের পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিন লাইব্রেরি ঘরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হল।…

ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭টা। শহীদ সত্যেন বসুর ঘরে তাঁর ফটোর নীচে কেতনবাবু, মেজদা, রঘু এবং আমি বসে আছি। আলোচনা চলছে, কিভাবে ওয়াচার-পরিবেষ্টিত শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

হঠাৎ রঘু বলে উঠল: "পুলিশের লোকেরা তো বাঙালী ছাত্র ও যুবকদের খুঁজছে? যারা বাঙালী নয় তাদের উপরতো ওদের নজর নেই। আমি বিমলকে মাথায় পাগড়ি বেঁধে গয়লার ছেলে সাজিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।"

আমরা অভিভূত! তথাকথিত অশিক্ষিত এই গয়লার কি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, কি অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা!

সবাই একবাক্যে পরম বন্ধু রঘু গয়লার কথায় সায় দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুর সুনিপুণ হস্তবিন্যাসে আমি অন্য এক কিশোরের রূপ গ্রহণ করলাম।…

রাত দশটা। একটি নিম্নশ্রেণীর মাতালের ভূমিকায় রঘুনন্দন গোপ ও তার কিশোর পুত্র শহীদ সত্যেন বসুর গৃহ থেকে বেরিয়ে এল। ঐ কিশোর পুত্রের বেশেই চলছি আমি। যাত্রা আমাদের স্টেশনের দিকে।

রঘু স্টেশনে পৌঁছে ছ'খানা তৃতীয় শ্রেণীর কলকাতার টিকিট

কিনে আনল। আমি নির্জনে একটি গাছের নীচে গয়লার ছেলে হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন ছাড়বার সময় হতেই বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত একটি নোংরা কামরায় আমরা উঠে গেলাম।

কিন্তু ট্রেণ যে ছাড়ছে না! রঘু তার স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় শুরু করল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে কথা বলতে লাগলাম জড়ান হিন্দিতে। আমার কথা অবশ্য 'হ্যাঁয়', 'নেহি', 'বহুৎ-আচ্ছা'র মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। আমি স্টেশনের দিকে পিঠ রেখে বসেছিলাম। দেখছিলাম চার পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ওয়াচারগুলো জানলা দিয়ে ঝুঁকেঝুঁকে ট্রেণের কামরাগুলো খোঁজাখুঁজি করছে।

কিন্তু রঘুর অভিনয়ের কাছে তাদের হার হল। আমাকে নিরাপদে সে কলকাতায় নিয়ে এল। রঘুভাইকে আলিঙ্গন করে আমি বিদায় হলাম। রাজেনদার আস্তানা আমি চিনি। তাঁর আশ্রয়ে আবার স্থান হল।...

রাজেনদার গৃহে আমাকে বেশিদিন রাখা হল না। কারণ, পুলিশ আমার ফটো সংগ্রহ করে ফেলেছে। অধিকন্তু ইতিমধ্যে কাগজেও একটি ঝি-র ছেলের চাঞ্চল্যকর উক্তি বেরিয়েছিল: "বিমলদা সাহেবকে মেরে পালিয়ে গেছে।"...

একদিন ফুলদা (প্রফুল্লদা) এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বাঙলার বাইরে ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের উদ্দেশে। সেখানে ফুলদার দু'জন বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আমাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁদের নাম কৃষ্ণকালী বসু এবং পুলিনবিহারী পাইন। কৃষ্ণকালীবাবু আমাকে নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। আমাকে বিদেশে পাঠাবার প্ল্যান তাঁর মাথায় আসছিল। পরম যত্নে আমি এঁদের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কাগজে একটা সংবাদ পড়ে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। খবরে প্রকাশ:—"গত রাত্রে একটার সময় দুইজন

লোক ছোরা হস্তে বিমলের গৃহে যাইয়া তাহার পিসিমাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, এবং বিমল কোথায় আছে তাহা জানিতে চায়। বিমলের পিসিমা আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিতেই বিমলের পিতা ও মেজদাদা ছুটিয়া আসিলে দুর্বৃত্তরা পালাইয়া যায়।”...

ভাবলাম বিচিত্র এই সংসার! একদিকে দেশপ্রেমী, ভয়ডরহীন রঘুর মত পূজনীয় ব্যক্তি—অপর দিকে ইংরেজের পদলেহী, ঘৃণ্য এই পুলিশী এজেন্টদের মত অমানুষ!

এসময় আমার চলাফেরায় কোলিয়ারির লোকেদের হয়ত কিছু সন্দেহ হচ্ছিল। পুলিনবাবু সে সংবাদ কলকাতায় পাঠাতেই আমাকে অন্য আস্তানায় আনা হল।

আমাদের দলেরই কর্মী, রসময়দার সহপাঠী বিনোদ দাস, তখন আসানসোলে একটি কলিয়ারির ম্যানেজার। তাঁর স্ত্রীর নাম পুতুল দেবী। পুতুল আমাদের রাজেনদার জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়সে আমার ছোট। আমি তাঁদের কাছেই পুতুলের ভাই রূপে থেকে গেলাম।...

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আমাদের দীক্ষাগুরু ও নেতা দেশের গৌরব দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল।

এ বিচার-প্রহসনের জন্য গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন আলিপুর সেশান্-জজ মিঃ গার্লিক।

দণ্ডদাতা মিঃ গার্লিককেও বিপ্লবীর বিচারে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে—সিদ্ধান্ত নিলেন বি-ভি-র ‘য়্যাকশান্ স্কোয়াড্’।

১৭ই জুলাই আমাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। ১৮ই জুলাই গার্লিককে শাস্তিদানের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি পার্টির নির্দেশে। কিন্তু তখন জানতে পারিনি কি কারণে যেন আমাকে আর ঐ য়্যাকশানে পাঠান হল না।

দুঃখ হল আমার। কিন্তু পার্টির আদেশ ভগবানের বিধান থেকেও আমাদের কাছে অলঙ্ঘ্যনীয় ছিল।···নীলমণি দত্ত লেনে নেপালদার (নাগ) হেপাজতে একদিন রেখে আমাকে আবার বাঙলার বাইরে পাঠান হল।

এল ২৭ শে জুলাই। কাগজে পড়লাম, গার্লিক সাহেব তাঁর বিচারকক্ষেই একটি অজ্ঞাত বিপ্লবীর গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন। দণ্ডদাতা ঐ কিশোরটি কাজ হাসিল করেই সায়ানাইড্ খেয়ে আত্মহত্যা করে শহীদলোকে চলে গেছেন।

প্রণাম করলাম অজানা শহীদকে। কে বা কারা এ কাজ করলেন তার হদিস পেলাম না। পরে অবশ্য শুনেছি যে আমাদের দাদাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেই এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি ব্যানার্জী মহাশয়।

তাঁর মন্ত্রশিষ্য কানাই ভট্টাচার্য ছিলেন ঐ অজ্ঞাত দণ্ডদাতা। কানাই ভট্টাচার্যের পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল: "ধ্বংস হও; দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও—বিমল গুপ্ত।"

গার্লিক হত্যার তিন মাস পর ইউরোপীয়ন্ য়্যাসোসিয়েশানের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলি করার অপরাধে বন্দী হলাম। তখনো আমি কানাই ভট্টাচার্যের কোন পরিচয় জানি না, তাঁর নামও আমার অজ্ঞাত।

কিন্তু তা হলে কি হবে? লালবাজারে কানাই ভট্টাচার্যের পরিচয় আমার কাছ থেকে আদায় করার জন্য কী নির্যাতনই না আমাকে ভোগ করতে হয়েছে!

পুলিশের বড় কর্তাদের অভিমত—কানাই নাকি মেদিনীপুরের লোক। মৃতের চোখ, ঠোঁট, নাক দেখে তাঁরা নাকি নিশ্চিত যে

গার্লিক হত্যাকারী মেদিনীপুরের দামাল ছেলে না হয়ে পারে না। —কী ক্ষুরধার এঁদের বিচার বিশ্লেষণ! কী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি!...

এবার ভিলিয়ার্স-আক্রমণের ব্যাপারটা বলি।

১৯৩০ সালের পর থেকেই ইউরোপীয় বণিক-সমাজ এবং তাদের মুখপত্র স্টেট্‌সম্যান ও ইংলিশম্যান্ পত্রিকাগুলো তীব্র ভাষায় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

তারা প্রকাশ্যে বলল: এসব 'টেররিস্ট'দের কার্যকলাপের যথার্থ বুদ্ধিদাতারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে জেলে বসে আছে। তারাই সেখান থেকে সর্ববিধ বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং এক-একটি ইংরাজের প্রাণ হরণের বিনিময়ে এক একটি নামী বিপ্লবীকে জেল থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য স্থানে গুলি করে মারতে হবে।

এসব প্ররোচনা থেকেই ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলি বন্দীবাসে নিরস্ত্র রাজনৈতিক ডেটিনিউদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করল। ফলে অসহায় অবস্থায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে জীবন দিলেন বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন। আহত হলেন অনেকে।

দুঃসংবাদ ছড়িয়ে গেল ভারতবর্ষময়। এমন ঘটনা ইংরেজের রাজত্বেও ইতিপূর্বে ঘটেনি। জেলখানায় অবরুদ্ধ, অসহায় বন্দীদের উপর মাস্ স্কেলে গুলি চালানর ইতিহাস দুর্লভ। তাও আবার সকলেই বিনা বিচারে, রাজনৈতিক কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ!

স্বভাবতই দেশ জুড়ে ক্রোধ ও ঘৃণার ঝড় বয়ে গেল। বিপ্লবীরা এর প্রতিবাদ অগ্নির অক্ষরে সাক্ষরিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

তাঁদের নেতৃবৃন্দ ভাবছেন মিঃ ভিলিয়ার্স ও স্টেটস্‌ম্যান কাগজের প্রধান সম্পাদক মিঃ ওয়াট্‌সনের (বণিক-সমাজের প্রতীক রূপে) আচরিত এ ঔদ্ধত্যকে স্তব্ধ করে দেবার প্ল্যান।

এই সময় আমি আবার রাজেনদার গৃহে আশ্রিত। কাজের পূর্বদিন দাদারা জানালেন যে পরের দিন আমাকে ভিলিয়ার্স-নিধনে যেতে হবে!

আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি এতাবৎ শুধুই ভাবছিলাম, শহীদ বিনয় বসুর মত আমিও 'Double Action'-এর গৌরব লাভ করব—সফল ও রাজনীতিক-গুরুত্বপূর্ণ 'ডাবল্‌ য়্যাক্‌শান'!...

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩১ সাল। খুব ভোরে এসে উপস্থিত হ'লাম আমাদের পার্কসার্কাস শেল্টারে। নিউ পার্কস্ট্রিটের উপরই সে বাড়ি।

প্রত্যুষে খবরের কাগজ পড়েই আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। খবর ছিল: "গতকাল (২৮. ১০. ৩১) সন্ধ্যায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো বিপ্লবীদের গুলিতে ঘায়েল হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক।"...

আমি যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়েছি। কথা ছিল ইউরোপীয় পোষাক পরেই আমি কার্যস্থলে যাব। কিন্তু অভিজ্ঞ দাদারা আমাকে পশ্চিমা মুসলমান-ব্যবসায়ীর সাজ পরিয়ে দিয়েছেন।

'সর্বাদা' অর্থাৎ বিনয়দার (স্বর্গগত বিনয় সেনগুপ্ত) উপর ভার ছিল তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ভিলিয়ার্স সাহেবের চেম্বার পর্যন্ত।

গিলিণ্ডার্স হাউসের তেতলায় আমি অপেক্ষা করব, বিনয়দা দেখে আসবেন ভিলিয়ার্স্ তাঁর কামরায় আছেন কিনা। বিনয়দা কামরা দেখিয়ে চলে যাবার ঠিক দশ মিনিট পর আমি সাহেবকে আক্রমণ করব।

প্রফুল্লদা অবশ্য ইতিপূর্বে গিলিণ্ডার্স্ হাউস ও ভিলিয়ার্স্-এর কামরা ইত্যাদির নক্সা নিজে উপস্থিত থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

দাদারা বিনয়দাকে বলে দিয়েছিলেন যে, কামরায় ভিলিয়ার্স্ একা থাকলেই তিনি আমাকে 'গ্রীণ সিগন্যাল' দেবেন। নচেৎ আমাকে তিনি সঙ্গে করে ফিরে আসবেন।

দাদাদের আমার প্রতি আদেশ ছিল: "তোমার চলাফেরা যেন খুব স্বাভাবিক ও সন্দেহমুক্ত হয়। তুমি ভুলে যেও যে, তুমি বাঙালী 'বিমল দাসগুপ্ত'। তুমি মনে রেখো, তুমি একজন প্রতিষ্ঠাবান তরুণ আপ কাণ্ট্রি ম্যান্—ব্যবসায়ীর পুত্র ঘোর ব্যবসায়ী। গতকাল ডুর্নো আক্রান্ত হয়েছেন। ওরা তাই বাঙালী তরুণ মাত্রকেই মৃত্যুদূত মনে করে আতঙ্কিত থাকবে।

আমিও তাই দাদাদের আদেশ স্মরণ রেখে চেন্ সিগারেট্ ফুঁকতে ফুঁকতে ব্যস্তবাগীশ ব্যবসাদারসুলভ চটপটে ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলাম। সেই কালে সিগারেট বস্তুটি বিপ্লবীদের মস্ত একটা ক্যামোফ্লাজ্ ছিল। গোয়েন্দারা জানত (এবং ঠিকই জানত) যে, বিপ্লবীদলের ছেলেদের পক্ষে কোনরূপ নেশা করা বা অশ্লীলতার আশ্রয় নেওয়া নিষিদ্ধ। তারা যে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণীত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। তাদের লক্ষ্য দেশজননীর শৃঙ্খলমুক্তি, অগণিত জনসমুদ্রের বন্ধনক্ষয়। এ লক্ষ্যে পৌছবার উপায় আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিলয়ন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম, আদর্শে ভক্তি।

তখন প্রায় ১২টা। আমি সংকেত পেয়ে গিয়েছি। তেতলা থেকে নেমে এসে ভিলিয়ার্স-এর চেম্বারের দিকে যথা নির্দেশ রওনা

হলাম। সাহেব তাঁর কামরায় একা থাকবার কথা। আমি বিদ্যুৎ বেগে তাঁর কক্ষে ঢুকে গেলাম, এবং পরপর তিনটি গুলি করলাম।

কিন্তু বাস্তব আমার প্রতিকূল। তা' না-হলে ১০ মিনিট পূর্বের দেখা দৃশ্য (ভিলিয়ার্স একাকী ঘরে আছেন) কি করে আমার প্রবেশমুহূর্তে অন্য দৃশ্যে পরিণত হল? ইতিমধ্যে ঐ ঘরে আরো তিন-চার জন সাহেব ঢুকে গেছে।

আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল যে একটা সাহেবকে ঘায়েল করতে আমার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না; অধিকন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম যে ফার্স্ট বুলেট্, আক্রান্তদেরকে ভয় পাইয়ে দেয়—প্রতিবাদ করার মত সাহস অনেকেরই থাকে না। তাই নিশ্চিন্ত চিত্তে ভিলিয়ার্সের চেম্বারে প্রবেশ করেই আমি পকেট থেকে রিভলবার টেনে এনে গুলি করলাম।

কিন্তু আমার ছায়া দেখেই ভিলিয়ার্স-এর ইনটুইশান্ তাঁকে সজাগ করে দিল। উদ্যত রিভল্‌বার নিয়ে ঘরে ঢুকেই গুলি করলে দু'এক সেকেণ্ড সময় বেশি পেতাম—তন্মধ্যে ভিলিয়ার্স-এর বুক দীর্ণ করে বুলেট বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা হল না। আমার বুলেট তাঁর বুকে সোজা বিদ্ধ হবার সুযোগ পেল না, তির্যক ভাবে তাঁর অঙ্গ বিদ্ধ করল। তিনি টেবিলের নীচে পলায়নের অবকাশ পেলেন। ভিলিয়ার্স-এর দিকে ব্যারেল এর মুখ থাকাতে অপর সাহেবগুলো আমার দেহপার্শ্বের অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিল।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে ভিলিয়ার্স-এর চেম্বারটির প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের দ্বার ছিল একটিই। আমি সেই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে। কাজেই পালাবার কোন পথ না থাকায় তারা প্রাণের তাগিদে মরিয়া হয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে আমি সায়ানাইড্ গিলে ফেলার সময়টুকুও পেলাম না। এদিকে আমি বন্দী—সাহেবদের হাতে। তারা চেঁচাচ্ছে: "God has saved us! God has saved us!"…

একটু দম নিয়ে তারা সমস্বরে প্রশ্ন করে: "Why have you come to shoot Mr. Villiars?"

আমি উত্তর দিলাম: "Listen, the savage repressions in Midnapore, Chittagong and in Hijli camp were always inspired by the European Association. So I have come to settle accounts with its President."

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশের কর্ণধারদের আগমন ঘটল। আমাকে তুলে আনা হল পুলিশ-ভ্যানে লালবাজার লক্-আপে। তারপর শুরু হল অত্যাচারের অমানুষিক তাণ্ডব।

সন্ধ্যা ৭ টায় পুলিশ-কমিশনার (তৎকালীন) মিঃ কলসনের কাছে আমাকে উপস্থিত করা হল। আমার দিকে তাকাতেই আমার রক্তাক্ত চেহারা দেখে সাহেব শিউরে উঠলেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অনুচরদের আদেশ দিলেন তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

চিকিৎসার হুকুম এলেই তার ব্যবস্থা হয় না। কাজেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশের দক্ষিণহস্ত নলিনী মজুমদারের কাছে। তিনিও আমার অবস্থা দেখে কোন প্রশ্ন করলেন না। আমি পুনরায় সশস্ত্র সার্জেন্ট পরিবৃত হয়ে লালবাজার থানার প্রবেশদ্বারে আনীত হলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য। আমারই অজান্তে ভ্যান্ থেকে নেমেই আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। কেন এই অট্টহাসি, তা' তখনো আমি জানি নে। যেসব ইউরোপীয় সার্জেন্ট লালবাজার লক্-আপে আমার উপর অত্যাচারের চাবুক চালিয়েছে তারাতো অবাক! তাদের সম্মানে আঘাত লেগেছে। তারা চিৎকার করে বলে উঠল: "What! the boy is laughing!"—এই বলেই তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাকে 'কিক্' করা শুরু করল। আমি ফুটবলের মত ওদের পায়ে পায়ে গড়াতে লাগলাম।

ওদের কানে তখনো বাজছে 'Royalist-দের কণ্ঠঃ' "Yesterday Durnoe! To-day Villiars!" আমার উপর তার শোধ তোলা ঐ পশুগুলোর পক্ষে তাই একটুও অস্বাভাবিক নয়।...

পরবর্তীকালে কারাগৃহের নির্জন পরিবেশে আমার সেই অট্ট-হাসির উৎস খুঁজেছি। আমার ধারণা, ওটা ছিল আমার স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশের ব্যর্থতা দেখে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-ব্যঞ্জনা।...

লালবাজার গেটে মার খেয়ে অচৈতন্য হবার পরই সহসা আমার উপর অত্যাচারের পালা শেষ হল।

দিন দুই পর থেকেই সন্ধ্যা ছ'টা হতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে পরম সহানুভূতি ও মায়ামমতার ছলনা করে আলাপ করতে থাকলেন 'এস্. বি'-র মধুকণ্ঠ জগৎ ভট্টাচার্য এবং পুলিশের খ্যাত ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়েল্ শশধর মজুমদার।

ভোর ছ'টা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত গালগল্প চালাচ্ছেন জগৎবাবু মা-মাসীর দরদ ঢেলে। রাত বারটার পর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত শশধরবাবুর অভিনয় চলেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-বিপ্লবিয়ানার ভঙ্গি বজায় রেখে নানা তত্ত্ব আলোচনায়। আলোচনা এক তরফা। আমি হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছি সুবিধে মত।

একদিন জগৎবাবু একটা কৌটায় করে কতগুলো রসবড়া এনে আমার সামনে রাখলেন। হাস্য বিকশিত করে বললেনঃ "নিন মশায়, আমার গিন্নীতো আপনার উপর মারপিটের কাহিনী শুনে কেঁদেই আকুল। দু'দিন ধরে আহার নেই তাঁর। আজ পরম আদরে কিছু রসবড়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য। আমিতো, মশায়, মিনিটে-মিনিটে পান খাই। তা পানের কৌটা থেকে পান ফেলে দিয়ে রসবড়াগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নিন, খেতে আরম্ভ করুন। সত্যি আপনারা আমাদের গৌরব।"...

উঃ, কী ঘৃণ্য জীব এরা! কী ঘৃণ্য এদের অভিনয়!...আমি

জগৎবাবুর অভিনয়ে সাড়া দিতে পারলাম না। অবশেষে আমার দু' হাত ধরে অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন: "দেখুন, আমাকে যখন কিছু জানালেন না, তখন শশধরবাবুকেও কিছু জানাবেন না। বলুন, আমার কথা রাখবেন?"

শশধরবাবুও আমাকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন। আমি আগ্রহে উভয়ের অনুরোধই রেখেছিলাম। আজও উভয়েই বেঁচে আছেন। তাঁরা আমার এ উক্তি অসত্য হলে অনায়াসে প্রতিবাদ করতে পারেন।

লালবাজার থাকা কালেই তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে ভিলিয়ার্স-আক্রমণ-মামলায় আমার বছর দশেক সাজা হবে, কিন্তু পেডি-হত্যা মামলায় আমার ফাঁসি অবধারিত। ভগবান এলেও নাকি আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আমি তখন ঠাট্টা করে বলে ছিলাম: "আহা: এটাতেও যদি আপনারা 'ফাঁসি'র ব্যবস্থা করতে পারতেন তবে আমি বিনয় বসুর গৌরবকেও ম্লান করে দিতে পারতাম দু'বার করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ে!"...

১০ই নভেম্বর ১৯৩১ সাল। আলিপুর কোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ভিলিয়ার্স গুলি. মামলার বিচার শুরু হল। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন সেশান্ জজ্ মিঃ বার্টলার।

সাক্ষীরা এক এক করে তাদের সাক্ষ্য দিয়ে গেল। ভিলিয়ার্স-এর গায়ের বুলেটবিদ্ধ রক্তাঙ্কিত জামাগুলো এক্‌জিবিট রূপে দাখিল করা হল।

কিন্তু স্বয়ং ভিলিয়ার্স কোথায়? সাক্ষ্য দিতে তাঁর তো সাক্ষাৎ নেই।—

পরে জানলাম, ঘটনার দিন দুই পরেই তিনি নাকি ভারত ছেড়ে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি জানতেন টেগার্ট সাহেবের হাল। ব্ল্যাক্‌লিস্টের যেকোন লোক বিপ্লবীদের হাতে বারে বারে টার্গেট

হবেই হবে। 'মৃত্যু' ছায়ার মতই তাঁকে অনুসন্ধান করছিল বুঝি? তাই ক্ষমতা ও অর্থের মায়া ত্যাগ করে প্রাণের মায়ায় তিনি পালিয়ে গেলেন।

১১ই নভেম্বর। কাগজের মাধ্যমে সবাই জেনেছে যে আজ ভিলিয়ার্স্-শুটিং-মামলার রায় বেরুবে। কোর্টে প্রচুর লোক সমাগম।

সাক্ষীদের বক্তব্য দাখিল করার পর বার্টলার সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সত্যি ভিলিয়ার্স্‌কে গুলি করেছিলাম কি না। উত্তরে আমি বললামঃ হ্যাঁ। ভিলিয়ার্স্ সাহেবকে নিধন করার সংকল্পেই আমি তাঁর চেম্বারে ঢুকেছিলাম, তাঁকে গুলি করেছিলাম।"...

বিচারে আমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল—যেটা লালবাজার থাকা কালেই জগৎবাবু আমাকে বলেছিলেন। আমার এই অদ্ভুত বিচারে বিস্ময় লাগল। এ প্রহসন যেন বিচিত্র।

তখন বুঝিনি, তখন জানিনি এর পশ্চাতের রহস্য। পরে শুনেছি যে, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র এবং দেশপ্রেমী শরৎচন্দ্রের অনুরোধে তাঁদের আত্মীয় তৎকালীন এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল মিঃ এন্. এন্. সরকার গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে সাজা-বৃদ্ধির চাপ দেন নি। কারণ তাঁকেও শরৎবাবু বুঝিয়েছিলেন যে—পেডি-হত্যা-মামলায় কচি ছেলেটার ফাঁসি তো অবধারিত, সুতরাং ভিলিয়ার্স্-শুটিং-মামলায় সরকার-পক্ষের 'ম্যাগ্‌নানিমাস্' হতে বাধা কি?...

বিপ্লবীরা জানেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের কত বড় বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন। সুভাষচন্দ্রতো বিপ্লবীগোষ্ঠীরই অনন্য প্রতীক। 'নেতাজী'র গরবে গরবিনী এই ভারতবর্ষ।...

১৯৩২ সালের ১২ই জানুয়ারি শুরু হল আমার বিরুদ্ধে পেডি-হত্যার মামলা।

সাম্রাজ্যবাদী-ব্রিটিশের ভক্তকুল আনন্দে ডগমগ। কারণ তারা প্রচুর অর্থব্যয়ে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাকি যোগাড় করেছে। পুলিশপক্ষের সাক্ষী সাবুদ-সংগ্রহে বিরাম নেই। তাই তারা ন্যায়-বিচারের যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দেবার ভরসায় আহ্লাদিত।

হাইকোর্টের তিনজন জজকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল (হাইকোর্ট) গঠন করা হল। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি পিয়ার্সন্। অন্য দু'জন জজ ছিলেন হাইকোর্টের এস্. কে. ঘোষ এবং এস্. সি. মল্লিক। সরকার পক্ষে স্বয়ং এ্যাড্ভোকেট্ জেনারেল দাঁড়ালেন। তাঁর সহায়ক এ্যাড্ভোকেট্ রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে বিপ্লবীকুলতিলক সুভাষচন্দ্র তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র ও স্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন সর্বক্ষণ এই ধান্দায় যে কি করে আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনা যায়।

তাঁরা স্থির করলেন, বিপ্লবিনী বিমলপ্রতিভা দেবী আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিজয় দাশগুপ্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তরফ থেকে যোগা-যোগ রেখে আমার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থাদি করবেন।

ব্যবস্থানুসারে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টারদের অন্যতম বি. সি. চ্যাটার্জি, এন্. আর. দাসগুপ্ত. এ. কে. বসু এবং য়্যাড্ভোকেট বি. এন্. সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পক্ষ অবলম্বন করতে এগিয়ে এলেন।...

এদিকে পর্দার অন্তরালে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে, যার ফলে ইংরেজ ও তার বেতনভুক্ দালালদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

যেসব সাক্ষী পুলিশের তাঁবে এবং টাকাপয়সা ও চাকুরির প্রলোভনে একটি শক্ত বন্ধনে আকৃষ্ট হয়েছিল—তাদের সেই বন্ধন

কেমন করে যেন আল্‌গা হয়ে যেতে লাগল। এর কারণ অবশ্য ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছিল।...

পেডি-হত্যার আসামীরাতো ফেরার। একজনের কিছু সন্ধান পেলেও অপর ব্যক্তি বেমালুম উধাও। উধাও—যতিজীবন কিন্তু ঘরে বসেই আছেন দিব্যি নিশ্চিন্তে।

এই অবসরে আমাদের বিপ্লবী-সতীর্থরা সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরই সঙ্গীসাথী ও প্রভাবিত ব্যক্তিরা সমানে ঐ তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষীগোষ্ঠীর কানে নানা ভাবে একটি কথাই তুলছেন: "তোমার মা-বোনের ইজ্জৎ যারা নষ্ট করেছে, তোমার জননী-জায়ার পবিত্র দেহ যারা উলঙ্গ করে হেসে উঠেছে, তোমার বুভুক্ষু শিশুর ভাতের থালা যারা পদাঘাতে চূর্ণ করেছে, তোমার অগণিত দেশবাসীর রক্তে যারা এই মেদিনীপুরের মাটি সিক্ত করেছে—তাদের একান্ত প্রতীক এই পেডি। পেডি দেশের মহা শত্রু। পেডিকে যাঁরা হত্যা করেছেন তাঁরা দেশের বন্ধু। তোমাদের গৌরব। পেডি-হত্যার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী দেওয়া নারী-হত্যারও অধিক পাপ। দেশের বিরুদ্ধে এ হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ।"

তা' ছাড়া এও শোনান হয়েছে যে, বিপ্লবীদের হাতে বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যে-গভর্ণমেণ্ট তার পেডি-লোম্যান্‌-সিম্পসন্‌কে বাঁচাতে পারে না, সে পারবে কি রামা-শ্যামা সরকারী-সাক্ষীগুলোকে বাঁচাতে?"

এসব শুনে সাক্ষীদের মনোবল ক্ষীণ হতে-হতে একেবারেই বিলুপ্ত হল। তা'ছাড়া অন্যদিকে রয়েছেন নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁ। মেদিনীপুরের গৌরবশিখা স্বর্গীয় নরেন্দ্রলাল খাঁর যোগ্য পুত্র এই দেবেন্দ্রলাল। আজন্ম স্বদেশসেবী এবং বিপ্লবীদের পরম বন্ধু দেবেন্দ্রলাল সুভাষচন্দ্রেরই দলভুক্ত কংগ্রেসের প্রথম সারির কর্মী। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সাক্ষীদের ভাগিয়ে দিতে থাকলেন। কিন্তু রয়ে গেল প্রধান সাক্ষী রূপে সুশীল দাস। পুলিশের অটুট কব্জায়

রয়েছে সে। তার বাবা ছিলেন রাজ-কাছারির কর্মচারী। রাজা দেবেন্দ্রলাল তাঁকে শেষটায় ডাকিয়ে এনে স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর ছেলে 'বিমলে'র বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে পুত্রের অপরাধে তাঁকেই কাছারির কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। রাজা বললেন: "কোন দেশদ্রোহীর পিতা নাড়াজোলের দপ্তরে কাজ করতে পারেন না। নাড়াজোলের প্রজারা 'দেশদ্রোহী'র পিতাকে চান না। তাঁদের অন্তরের কথাকে আমি স্বীকার না করলে তাঁরা আমাকে ঘৃণা করবেন; আমার পিতৃপুরুষের কাছে আমার প্রত্যবায় ঘটবে।"...

এ কথায় সুশীল দাসের পিতা অভিভূত হলেন। রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেনী তিনি যে, পুত্রকে তিনি বাধ্য করবেন 'সাক্ষী' হবার পথ প্রত্যাহার করতে।

বেলা ১২টা। হাইকোর্টের দোতলায় পেডি-হত্যার বিচার চলছে। প্রথমেই সরকারী-উকিল সুশীল দাস নামক প্রধান সাক্ষীকে ছোটখাট সাহায্যকারী-প্রশ্ন করে-করে মামলাটা সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। সুশীল সে-কাজের অন্তরায় হল না।

মাঝে একবার সরকারী-উকিল সুশীলকে জিজ্ঞাসা করলেন: "দেখতো, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ ছেলেটিকে তুমি চেন কি না?"

সুশীল বলল—"হাঁ"।

আবার তাকে প্রশ্ন করা হল: "সেই গোলমালের মধ্যে তুমি পেডিকে যারা মারল তাদের কি করে চিনলে?"

সুশীল উত্তর দিল: "ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তারপর খুব কাছে থেকে পটাপট গুলি ছোঁড়ে। আমি ওদের স্পষ্ট দেখেছি।" এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক নানা প্রশ্ন ও উত্তর চলতে থাকে।

অতঃপর সরকারী-উকিল অতিশয় প্রত্যয়ে প্রশ্ন করেন : "আচ্ছা, যে দু'জন ছেলে পেডিকে হত্যা করেছিল, তাদের একজন কি ঐ কাঠগড়ার ছেলেটি ?"

সুশীল অম্লান-বদনে উত্তর দিল : "না" ।...

সরকারী-উকিলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে কেঁপে উঠল। ধমকে বললেন তিনি : "এই তো বলেছ, তুমি ঐ ছেলেটাকে চেন ? বল নি ?"

সুশীলের উত্তর : "চিনি-ই তো। উনি তো আমাদের স্কুলেরই ক্যাপ্টেন্ ছিলেন। খুব ভাল খেলেন। শহরের সবাই ওঁকে ভালবাসে।"

সুশীল উকিলবাহাদুরের যুক্তিতর্কের তরী ডুবিয়ে দিল। পুলিশের ঐ একটি মাত্র প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষীরই যোগাড় ছিল। সেও তাদেরকে অমন নির্মম ভাবে অপদস্ত করল !...

এরপর বহু সাক্ষীরই আগমন ঘটেছিল। তাঁরা কেহই 'প্রত্যক্ষদর্শী' নন। তাই আমাকে চিনলেও আমার কার্যকলাপের সঙ্গে কারোই পরিচয় হয় নি। কাজেই বাঘা বাঘা আসামী-পক্ষায় ব্যারিস্টারদের কাছে ওসব সাক্ষী দাঁড়াতেই পারল না।

কিন্তু অস্ত্রবিশারদের বিবৃতি ছিল মারাত্মক কারসাজিতে ভরা। তাঁর রিপোর্ট্ বলছে যে, পেডির শরীর থেকে যে-বুলেট পাওয়া গেছে তার গায়ে একটি দাগ চিহ্নিত হয়ে আছে। ঠিক অনুরূপ দাগ-খাওয়া ঐ ভিলিয়ার্স্-এর শরীরে প্রাপ্ত বুলেট্টিও।

এসব ভনিতাও আমাদের জাঁদরেল ব্যারিস্টারদের অকাট্য যুক্তির চাপে স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মামলা মুলতবি রাখার চেষ্টা হল। কিন্তু সাক্ষীদের পিটিয়ে এবং অধিকতর লোভ দেখিয়ে সজুত করার মতলব বিফল হল।

কাজেই বড় দুঃখে সরকারপক্ষ চোখের সামনে দেখল—পেডি-হত্যার মামলা খারিজ হয়ে গেছে !...

পেডির মৃত্যুর পর এবার বাঙলার পুলিশবিভাগের দম্ভও মৃত্যুবাণে বিদ্ধ হল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভাঙে তবু মচ্‌কায় না। তাই সাত দিনের মধ্যেই বঙ্গদেশে এক আইন জারি হল যে, অতঃপর 'হত্যা' শুধু নয়, 'হত্যার চেষ্টা' বা তৎসঙ্গে জড়িত থাকিলেই বিপ্লবীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে।...

কিন্তু বিপ্লবীদের দমন করা গেল না। পর পর যেসব প্রচণ্ড য়্যাক্‌শান বাঙলার বুকে বিপ্লবীরা ক্রমান্বয়ে ১৯৩৪—'৩৫ সাল অবধি চালিয়ে গেলেন, তার গুরু গর্জন আমি কান পেতে শুনে যেতাম আন্দামানের সেলুলার-জেলে বসে গভীর আনন্দে।

সে আনন্দ নিজের হাতে য়্যাক্‌শান্‌ করার আনন্দ থেকে কম উপভোগ্য ছিল না। শৃঙ্খল-জর্জরিত বন্দীর নির্বাসনে এসব সংবাদ আমরা আকণ্ঠ পান করতাম 'elixir'-এর মত।...

কর্ণেল গোলা,
মেদিনীপুর।
॥২৩. ১০. ০॥

শ্রীবিমল দাশগুপ্ত

এবার শোন প্রদ্যোতের সহকর্মী শ্রদ্ধেয় ফণী দাসের কথা, পরবর্তী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস হত্যার ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

কেন সেদিন প্রদ্যোতের রিভলবারটি কার্যকালে অকেজো হয়ে পড়েছিল? কোথায় সেই রহস্যের উৎস?

এই দলিলটির মধ্যেই তুমি তার সদুত্তর পেয়ে যাবে আশাকরি।

ফণীবাবু বলছেন :—

"মেদিনীপুর হিন্দুস্কুল যেন বিপ্লবীদেরই আস্তানা। ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন প্রথম সারির কত কর্মী, যাঁরা অগ্নি-অক্ষরে লিখে গেছেন বিপ্লবের কাহিনী মেদিনীপুরের ইতিহাসে।

১৯২৭ সালে প্রখ্যাত দীনেশ গুপ্ত ঢাকা থেকে চলে আসেন মেদিনীপুর শহরে পড়াশোনার নাম করে। থাকেন বছর খানেকের মত এখানে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি গড়ে তোলেন একটি 'বিপ্লবীদল' স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের নিয়ে।

দীনেশদা 'বি-ভি'-দলের নেতাদের নির্দেশেই এখানেও দলের একটি শাখা-দল গঠন করলেন। তাঁর প্রধান সহায়ক হলেন পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু এবং হরিপদ ভৌমিক। তাঁদেরই বন্ধু প্রফুল্ল ত্রিপাঠীও এলেন, কিন্তু তাঁর উপর ভার ছিল কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে কাজ করার। অতি অল্পকালের মধ্যে সংগঠন-কার্য দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। হিন্দুস্কুল থেকে ভাল ভাল ছাত্ররা দলের কর্মীস্তরে ভিড়ে যান।

দীনেশদার সাহচর্যে কাদামাটির কিশোরদল যেন 'তরুণ বীরের বেশে' সজ্জিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ধনুকের টঙ্কার মেদিনীপুরের বালক কিশোরদের এক নতুন সঙ্গীত শোনাল—যা' নেশা জাগায়, যে-নেশায় জ্বলে সর্বনাশের আগুন।...

দীনেশদা আবার চলে গেছেন ঢাকা শহরে পার্টিরই নির্দেশে। তাঁর স্থলে এলেন শশাঙ্ক দাসগুপ্ত। তাঁকে ডাকতাম আমরা 'কমেট'দা বলে।

জানিয়ে রাখা ভাল যে, মেদিনীপুর-শাখা পুরোপুরি ভাবেই কলকাতা বি-ভি-কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হত। এটা কোন আঞ্চলিক দল নয়।

কমেটদা কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয়-সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু ও হরিপদ ভৌমিকের মাধ্যমে।

কলকাতায় কেন্দ্রীয়-সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগস্থল ছিল 'বেণু'-আপিস। আমাদের দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ।

পেডি-হত্যার পর পুলিশ যতই এ্যাকৃটিভ্ হয়ে উঠুক না কেন, তারা আমাদের কোন হদিস করে উঠতে পারছিল না। আমরাও সংগঠন-শক্তি বাড়িয়ে চলছিলাম। কঠোর মন্ত্রগুপ্তি ও একাগ্র কর্মচেতনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দেশবাসীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিপ্লবীদের উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অসহ্য এক বেদনার বার্তা নিয়ে এল ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই। আলিপুর জেলে সেই প্রভাতে মেদিনীপুর বিপ্লবীগোষ্ঠীর শৌর্যবান নেতা, আমাদের মন্ত্রগুরু দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন। তাঁর পত্রাবলী-অঙ্কিত 'বেণু'-র দীনেশ-সংখ্যা আমরা চোখের জলে পাঠ করছি। ও আমাদের জীবন-গীতা। আমাদের চোখের জল আগুন-ছোঁয়া। মেদিনীপুরের ছেলেরা তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু ও নেতার রক্তের বদলে দেবেন আরো রক্ত, লোপাট করবেন সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত-শাসকের দম্ভকলঙ্কিত সিংহাসন। প্রস্তুত তাঁরা। কলকাতার দাদাদের হুকুমের অপেক্ষা।....

কেটে গেল আরো কয়েকটি মাস। এল ১৯৩১ সালেরই ২৯শে আক্টোবর।

সহসা শুনলাম গিলিণ্ডার্স্-হাউসে ইউরোপীয়ান্ য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছেন আমাদেরই বন্ধু বিমল দাশগুপ্ত।

বিমল ও যতিজীবন পেডিসাহেবকে হত্যা করেছিলেন। যতিকে পুলিশ টের পায় নি। বিমলকে পুলিশ ক্রমে সন্দেহ করেছিল বলে

প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন পলাতক। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয়-সংস্থার হেপাজতে।

সেই বিমল দাশগুপ্তই দ্বিতীয়বার রুদ্রের বেশে আবির্ভূত হয়ে ভিলিয়ার্সের রক্ত ঝরিয়েছেন জেনে মেদিনীপুরের ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমরা গর্বিত হ'লাম।...

ইতিপূর্বে ১৯৩১ সালেরই ৩১শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জিলায় হিজলী বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র-বন্দীদের গুলি করা হয়েছে। সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন পুলিশের বুলেটে জীবন দিয়েছেন। অন্তত বিশজন আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। সারা দেশে বিক্ষোভের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, শাসমল প্রমুখ বরেণ্য নেতারা কঠিন প্রতিবাদে মুখর।

ঠিক তারই ২৯ দিন পরে একটি কিশোর ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিনিধির রক্ত ঝরিয়ে কম্বু-কণ্ঠে বললেন: "The Savage repressions in Midnapore, Chittagong and Hijli camp were always inspired by the European Association. So I came to settle accounts with its President."

এই কিশোর মেদিনীপুরেরই সন্তান। এই কিশোর আমাদেরই সতীর্থ, শহীদ দীনেশ গুপ্তর স্নেহধন্য বিপ্লবী-কর্মী বিমলকুমার!...

হিজলি শুটিং নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি বসাতে হয়েছিল সরকারকে, জনমতের চাপে। কমিটির রিপোর্ট বেরুল। তাতে কর্তাদের কোন ত্রুটির কথা বলা হল না। কয়েকটা সাধারণ সেপাই-এর ত্রুটি ধরে 'ইম্পার্শেল এন্‌কোয়েরি'র দায়িত্ব সারা হল। রিপোর্ট তৈরি করার ব্যাপারে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগ্‌লাস সাহেবের মুন্সিয়ানা ছিল প্রচুর। কাজেই তিনি বিপ্লবীদের কালো-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেন।

ভিলিয়ার্স-আক্রমণের পর আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিন

মাস মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখার পর নিজেদের মতলবেই আমাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

ঐ সময় শ্রীমান মৃগেন দত্ত (পরবর্তীকালে বার্জ-হত্যার শহীদ) আমাদের বাড়িতেই ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তার সূত্রে থাকতেন। আমার কার্যকলাপে এবং দলের সংগঠন-ব্যাপারে মৃগেন আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে উঠলেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা পুলিশের দেওয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডিকে সংগঠনের কাজের দিক থেকে অকেজো করে দিল।

মৃগেনের দেশপ্রেম, পার্টির প্রতি আনুগত্য এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ছিল অটুট। সাহসে, বীর্যে ও নিয়মানুবর্তিতাবোধে দীপ্ত ছিলেন তিনি প্রতি মুহূর্তে।…

এই সময়েই একদিন কলকাতা থেকে নির্দেশ এল, জেলাশাসক মিঃ ডগ্‌লাসকে হত্যা করতে হবে।

খবর সংগৃহীত হল যে, ডগ্‌লাস্ সাহেব ফেরি-ঘাট থেকে কংসাবতী নদী পার হয়ে কাঁথি যাবেন সরকারী কাজে। দীনেশদার সহকর্মী ঢাকার বীরেনদা (বীরেন ঘোষ) হু'টো রিভলভার কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে আমাদের একান্ত বন্ধু শচীন কানুনগোর গৃহে নিয়ে গেলাম। ঐ গৃহে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালের ট্রেণে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে গেলেন।

ঐ রিভলভার হু'টির একটি প্রভাংশু পাল এবং অপরটি প্রমথ মুখার্জিকে দিয়েছিলাম।

ডগ্‌লাস্ নদী পার হবেন সরকারী বোটে। প্রভাংশুদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তাঁরা হু'জন যেন অন্য একটা নৌকায় স্নানের ঘাট থেকে পার হবার ছল করে কাছেপিঠে অপেক্ষা করেন। সাহেবের গাড়ি এসে অল্পক্ষণ থেমেই পারাপারের বোটে উঠবে। সেই মোক্ষম মুহূর্তে হু'পাশ থেকে সাহেবকে গুলি করতে হবে।…

গাড়ি যথাসময়ে এল। ডগ্‌লাস্ নামলেন বেশ কয়েকজন সশস্ত্র

দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে। প্রভাংশুদের গুলি করার সুযোগ মিলল না।

আমি কিছু দূরে নদীর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম প্রমথ মুখার্জির অস্বাভাবিক গতিবিধি, অথচ প্রভাংশুর বিন্দুমাত্র জড়তা লক্ষ্য করলাম না। তখনই স্থির করলাম যে পরের অভিযানে প্রভাংশুর সঙ্গী রূপে আর কাউকে দিতে হবে, যাঁর দুর্জয় পদক্ষেপেও থাকবে প্রশান্তি বিরাজিত।...

আমাদের দিনগুলো অসম্ভব উত্তেজনায় কেটে যাচ্ছে। ডগ্‌লাসের গতিবিধি নূতন করে খোঁজ করছি। কিন্তু তাঁকে পাওয়াই মুস্কিল। এত সতর্ক তাঁর অবস্থান। ইউরোপীয় মাত্রই তৎকালে দুর্লভ হয়ে উঠ্‌ছিল। ভয়ে ও আতঙ্কে তারা তাদের চতুর্দিকে লৌহ-প্রাচীর তুলে রেখেছিল।

আমার বিশেষ বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য। হিন্দুস্কুলের কৃতী ছাত্র। দীনেশদার প্রিয় মন্ত্রশিষ্য।

একদিন তাঁকে বললাম: "ছ্যাখোতো, মেদিনীপুরের বুকে বসে, হিজলি-জেলে বিপ্লবী-বন্ধুদের ওরা কুকুর-বেড়ালের মত হত্যা করল। হাতে-পায় শৃঙ্খল পরিয়ে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীর এমন নৃশংস-হত্যার ইতিহাস কোথাও আছে কি? আর দেশবাসীর চাপে সরকার যে এন্‌কোয়েরি করল তার রিপোর্ট মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগ্‌লাস্‌ কি কুৎসিত মিথ্যায় সাজিয়ে দিল ?...এসো ভাই, তুমি আর আমিই এর একটা উত্তর দিই। কলকাতা থেকে দলের নেতারা 'গ্রীণ্‌ সিগ্‌ন্যাল' দিয়েছেন। এসো ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

প্রদ্যোৎ শান্ত কণ্ঠে বললেন: "আমি বৃত্তির জন্য জেলাবোর্ডে দরখাস্ত করেছি। তার তদ্‌বিরে প্রায়ই, ভাই, বোর্ড-আপিসে যাতায়াত করি। আমি শুনেছি, আগামী ৩১শে মার্চ বোর্ডের যে-সভা হবে তাতে ডগ্‌লাসই নাকি সভাপতিত্ব করবেন।"

আমি প্রদ্যোৎকে সঠিক খবর নিতে বললাম। পরদিন তিনি আবার খবর দিলেন যে, ৩১শে মার্চই ডগ্‌লাস জেলাবোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকছেন।

এদিকে হিজলি থেকে কমেটদা (শশাঙ্ক দাশগুপ্ত) খবর পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় য়্যাক্‌শান স্কোয়াডের অন্যতম নেতা ফুলদা (প্রফুল্লকুমার দত্ত) মেদিনীপুরে যাচ্ছেন। আমার উপর নির্দেশ—আমি যেন নূতন বাজারের কালীমন্দিরের কাছে সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

ফুলদার সঙ্গে যথাসময়ে সাক্ষাৎ হল।* এক গোপন স্থানে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুকে পূর্বেই রাখা হয়েছিল। সেই গোপন স্থান হল আমাদের শচীন কাননগোর মাণিকপুরের বাড়ি। শহরের এক প্রান্তে অতি প্রাচীন এই ভুতুড়ে বাড়িতে শচীন কাননগো বসবাস করতেন। অমন বিশ্বস্ত ও আদর্শস্থানীয় বন্ধু বড়ই বিরল। লোক চক্ষুর সম্মুখে থেকেও সবার অলক্ষ্যে আমাদেরই কাজ করে যাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। কাঁথি মহকুমায় বিপ্লবীদল পত্তনের নায়ক হরিপদদা (হরিপদ ভৌমিক) আমাকে এই শচীনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। শচীনের সাহস ও দূরদৃষ্টি, তাঁর সুনিপুণ পরিকল্পনা এবং অফুরন্ত কায়িক-পরিশ্রম করার ক্ষমতা-ও ছিল অসাধারণ। আজ দীর্ঘকাল পর এই দুর্লভ ও নিঃস্বার্থ বন্ধুটির কথা স্মরণ করে বারেবারে মাথা নুইয়ে আসে।···

আমাদের সম্মুখে ফুলদা (প্রফুল্লদা) উপবিষ্ট। প্রদ্যোতের কাছ

---

* এখানে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দত্তের লিখিত একখানি পত্র থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা বিধেয় মনে করি। পত্রখানা তিনি গত ৫ই অক্টোবর তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় মহাশয়কে লিখেছিলেন। পত্রোক্ত কয়েকটি পংক্তি হল: "পেডি ও ডগ্‌লাস-এর য়্যাকশানের পূর্বে অস্ত্র নিয়ে যে-দু'বার আমি মেদিনীপুর গিয়েছি, তখন আমার পিসতুতো দাদা খগেন গুহর ওয়ার্কশপের বাড়িতে ফণী দাস-ই আমার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেছেন। পরবর্তী দেখাসাক্ষাৎ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সব ব্যবস্থা ফণীই করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর অবদান আছে।"

থেকে শুনে তিনি জেলাবোর্ড আপিসের একটি নক্সা খাড়া করে ফেললেন। যে-ঘরে সভা বসবে তার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করলেন। প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুকে বললেন, তাঁরা যেন সাহেবের চেয়ারের কাছাকাছি দু'পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে দু'টি গুলি নিক্ষেপ করেন। তৎপর ডগ্‌লাসের মাথার উপরে দরজার কাছাকাছি দণ্ডায়মান থাকবে যে দেহরক্ষী, তাকে উভয়ে এক সঙ্গেই টার্গেট করবেন। এর পরমুহূর্তেই ডগ্‌লাসের দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি করতে হবে।...

ফুলদা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একটি ৪৫০ বোরের রিভল্‌ভার এবং একটি সাত চেম্বারের অটোমেটিক পিস্তল। দুটি অস্ত্রই তিনি আমাকে দিয়ে যান।

ফুলদার দেওয়া রিভলভারটি ছিল অস্বাভাবিক রূপে বড়। ওটা প্রভাংশুকে দেওয়া হল। আর পিস্তলটি দেওয়া হল প্রদ্যোৎকে। তাঁরা দু'জনেই ডগলাস্‌ হত্যার উদ্দেশ্যে ৩১শে মার্চ যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন কোন সুবিধা হল না। সভায় সামান্য হাজিরা দিয়েই ডগলাস তাঁর বাঙলোয় সশস্ত্র পাহারায় ফিরে গেলেন।

প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু ফিরে এলেন আমার কাছে। অস্ত্রগুলো রেখে গেলেন আমারই হেপাজতে। আমি তৎক্ষণাৎ রিভলভারটি হিমাংশু মিত্রের কাছে এবং পিস্তলটি অনাথ পাঁজার (পরবর্তী কালে শহীদ) তত্ত্বাবধানে রেখে এলাম।

পরে একটি ছোট কাঠের বাক্সে পুরে, খড়গপুর থেকে কিছুদূরে ধীত্‌পুর নামক গাঁয়ে, অনাথ পাঞ্জাদের চাষ-বাড়িতে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঐ ধীত্‌পুরে অনাথদের চাষ-বাড়িতেই ঢাকা থেকে ফিরে এসে

দীনেশদা কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন। তখন ঢাকায় 'Wire cutting case' চলছিল।

দীনেশদাকে পুলিশ ঐ কেসে জড়াবার আশায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অনাথদের ঐ বাড়ি থেকেই দীনেশদাকে সরিয়ে দেওয়া হল কাঁথিতে, অনিল মাইতির চাষ-বাড়িতে। রাইটার্স বিল্ডিংস্ অলিন্দ-যুদ্ধে যাবার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ শেল্টারেই ছিলেন।

১৯৩২ সাল। এপ্রিলের মাঝামাঝি সর্বদা (বিনয় সেনগুপ্ত) মেদিনীপুর আসেন। তিনি উঠলেন এসে বক্সিবাজার মহল্লায় চন্দ্রশেখরদার আস্তানায়। চন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত এবং তাঁর ছোটভাই শান্তিগোপাল সেনগুপ্ত 'বি-ভি'-দলেরই দায়িত্বশীল কর্মী ছিলেন। শান্তিগোপালকে বার্জ-হত্যা ব্যাপারে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তার করে (একটি 'স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল' দ্বিতীয় বার গঠনান্তে) বিচারের পর যাবজ্জীবন দীপান্তর-দণ্ড দিয়ে আন্দামান পাঠান হয়।…

সংবাদ পেয়ে চন্দ্রশেখরদার বাড়িতে গিয়ে আমি বিনয়দার সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানালাম যে, রিভলভারটি এবং তার বুলেটগুলো ভাল কাজ করছে না। সুতরাং আর একটি অস্ত্র পাঠান প্রয়োজন। তিনি সে-ব্যবস্থা করার ভার নিলেন।

তারপর একটি কাগজে তিনি লিখে দিলেন: "A fitting reply to premeditated, pre-arranged, barbarous and cowardly attempt on the Patriotic Sons of Bengal—Bengal Revolutionaries." এই লেখাটুকু দু'খণ্ড কাগজে টাইপ করিয়ে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুর হাতে দিতে হবে য়্যাক্‌শানে যাবার কালে।

অতঃপর তিনি প্রদ্যোৎসহ খড়গপুরের এক নির্দিষ্ট স্থানে আমাকে দেখা করার নির্দেশ দেন। যথাসময়ে প্রদ্যোৎকে নিয়ে বিনয়দার কাছে গেলাম।

বিনয়দা রাস্তায় পায়চারি করতে করতে প্রদ্যোতের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

কথা সমাপ্ত হলে আমাকে ডেকে তিনি আলাদা করে বললেন: "ছেলেটি খুব ভাল টাইপের।"···তিনি আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর দেওয়া লেখাটি যেন যথানির্দিষ্টভাবে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুকে কাজে যাবার কালে দিতে ভুল না হয়।

আমাদের সংবাদ, জেলাবোর্ডের একটি সভা বসছে ৩০শে এপ্রিল। এ সভায় ডগলাস্ সাহেব উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি।···

তিরিশে এপ্রিল বহুদূর নয়। অনাথ পাঁজার ধীত্‌পুরের চাষ-বাড়ি থেকে অস্ত্র আনান হয়েছে।

২৯শে এপ্রিল, সন্ধ্যা। এমন সময় প্রভাংশু কলকাতা থেকে এসে সরাসরি আমার বাড়িতে উপস্থিত। আমার হাতে তুলে দিলেন প্রভাংশু ৩৮০ বোরের একটি রিভলভার, ২৩টি বুলেট এবং ষাটটি টাকা। জানালেন—'মুরারিদা' (যথার্থ নাম সুপতি রায়) ওগুলো আমার হাতে দিতে বলেছেন। আরো জানালেন যে, মুরারি-দার নির্দেশ—রিভলভারটি সম্ভ যোগাড় হয়েছে, আমরা যেন কাজের পূর্বে পরীক্ষা করে নিই।

প্রভাংশুকে আমি জানিয়ে দিলাম যে পরদিন (৩০শে এপ্রিল) ভোর ৮টায় প্রদ্যোৎ আমার বাসায় আসবেন, প্রভাংশুরও ঐ সময়ই আসবার প্রয়োজন।···

শেষ রাতে সুপতিদা-প্রদত্ত রিভলভারটি সম্পূর্ণ লোড্ করে আমি সাইকেলে কংসাবতী নদীকে ডাইনে রেখে সড়ক ধরে এক নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হ'লাম।

একটি আম গাছের তলায় অন্ধকারে সাইকেলটি রেখে তিনটি গুলি ছুঁড়লাম। দেখলাম রিভলভার ঠিকই চলছে। বাড়ি ফিরবার

পথে 'কারবালা মসজিদে'র সংলগ্ন পীরবাবার 'স্থানে' দাঁড়িয়ে মানত করলাম—এবার যদি দুশমন বেটাকে (ডগ্‌লাস) ফেলতে পারি তবে পাঁচ পয়সা প্রণামী ঠিক দেব। তখন পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে—পীরবাবা এই পুণ্য মুহূর্তে কি মিথ্যে হয়ে যাবেন।...

বাড়ি ফিরেছি আটটার অনেক পূর্বে। সদর ঘরে বসে আছি। কত-না চিন্তা মাথায় দাপাদাপি করছে।...

প্রথমে এলেন প্রদ্যোৎ। তার একটু পরেই এলেন প্রভাংশু। তাঁদের আমি আমাদের অপর বাড়িতে নিয়ে গেলাম। সেখানে স্টোভ্ ধরিয়েই কিছু বালি গরম করে তার মধ্যে বড় রিভলভারটির বুলেট্‌গুলো নেড়েচেড়ে নিলাম। ঐ রিভলভারে বুলেট্ ভরে দিলাম। ওটা এবং অটোমেটিক্ পিস্তলটি প্রদ্যোতের হাতে তুলে দিয়ে প্রভাংশুকে দিলাম সুপতিদা-প্রদত্ত রিভল্‌ভারটি। ঐ ছাড়া প্রভাংশু ও প্রদ্যোৎকে দেওয়া হল পঁচিশটি করে টাকা ও সায়ানাইডের এ্যাম্পুল।

বিনয়দার নির্দেশ মত টাইপ করা সেই লেখাও তাঁদের দিতে ভুললাম না।

ইতিপূর্বে তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিল হিজলি ক্যাম্পে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদ লিপি। সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দুইটি কিশোর দুর্জয় পদক্ষেপে রওনা হলেন দুঃসহ অভিযানে।

রওনা হবার মুহূর্তে প্রভাংশু জানিয়েছিলেন যে, সুপতিদা অস্ত্রটি ঐ দিনই কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার 'চেষ্টা' করতে বলেছেন। আরো বলেছেন সুপতিদা যে, অস্ত্রটি বেশ দূর-পাল্লার। সুপতিদার 'চেষ্টা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ না করে আমি তার গভীরতর অর্থ করে বসলাম। ভাবলাম, যদি কাজের অব্যবহিত পরই পাঠাতে না পারি তবে আদেশ তামিল করা হবে না।

এখানেই আমার ভুল হল। আমার বোঝা উচিত ছিল যে, কাজ হাসিল করতে হবে আগে; অস্ত্র ফেরৎ পাঠাবার 'চেষ্টা' করতে হবে পরে। এই ভুলটি না-হলে প্রদ্যোতের ভাষায়ই বলব—"The story would have been other wise!"…যাকগে, আমি প্রদ্যোতের কাছ থেকে সুপতিদার প্রেরিত অস্ত্রটি রেখে দিলাম। প্রদ্যোৎ অপর অস্ত্র নিয়ে প্রভাংশুর সঙ্গে সানন্দে বেরিয়ে গেলেন।…

আমিও তখনই প্রতিবেশী ও সতীর্থ অনাথ পাঞ্জার গৃহে গেলাম। তাঁকে সাইকেলে মালপত্র সহ রওনা করে দিলাম তিনুদার কাছে। তিনুদার নাম হল অমর সেন। তাঁকে ধরতে হবে খড়গপুর 'রেলওয়ে ইন্সটিটিউট্ লাইব্রেরি' গৃহে। অধিকন্তু এ-ও বলা হল যে, তিনুদাকে ঐ দিনই বম্বে মেলে অস্ত্র সহ কলকাতা যেতে হবে-যথাস্থানে ওটা পৌঁছে দেবার জন্য।

কিন্তু তিনুদাকে পাওয়া গেল না। অনাথ তাই ধীত্‌পুরে তাঁর চাষ-বাড়িতে মালপত্র রেখে এলেন। সুপতিদা প্রেরিত ঐ অস্ত্র নিয়েই আমাদের ভূপাল পাণ্ডা পরবর্তীকালে এগ্‌রায় একটি ডাকাতি করে ফিরবার পথে বেল্‌দা স্টেশনে ধরা পড়েন। তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠান হয়েছিল।…

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সাল। দিনটি ছিল শনিবার।

আমার ঐ দিনেই থানায় হাজিরা দিতে হবে। বেলা চারটায় থানায় এসেছি। সেখান থেকে একটু এদিক-ওদিক করে হিন্দুস্কুলের মাঠে, অর্থাৎ ডায়মণ্ড গ্রাউণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছি।

তখনও মাঠে তেমন কিছু লোকজন আসে নি। তিন-চারটি ছেলে দূরে বল নিয়ে খেলা করছে। আমি সাইকেল-প্রাকৃটিসে মন দিচ্ছি, যেন কম্পিটিশানে নামবো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর লক্ষ্য করলাম মিঃ ডগ্‌লাস গাড়ি করে তাঁর বাঙলো থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন গিয়ে জেলা-বোর্ড গৃহে। সাহেবতো কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, কিন্তু দণ্ডদাতা প্রভাংশু—প্রদ্যোৎ তো তখনো এলেন না।

আমি দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছি। ভাবছি প্রদ্যোতের খোঁজ করব কিনা। এমন সময় দেখি অচঞ্চল দু'টি কিশোর প্রশান্ত চিত্তে এগিয়ে আসছেন।

আমি ইঙ্গিতে ডগ্‌লাসের আগমন-বার্তা জানিয়ে সাইকেল চেপে হস্‌পিটাল রোড্ ধরে অন্য পথ ঘুরে আবার মাঠে ফিরে এলাম।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সহসা শুনলাম পটাপট্ দু'তিনটি গুলির শব্দ। আমি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা নূতনবাজার 'কারবালা মসজিদে' এসে পীরবাবার 'স্থানে' তখনকার দিনের একটি আনি ও একটি পয়সা ভক্তিভরে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলাম আমাদের বড়বাজারস্থিত গহনার দোকানে।

একটু পরেই প্রথমে বন্ধু নরেন দাস এসে খবর দিলেন জেলাবোর্ডে ডগ্‌লাসের উপর গুলি করা হয়েছে; প্রদ্যোৎ ধরা পড়েছেন, প্রভাংশুর কোন খবর নেই।

প্রভাংশুর কথা ভাবছি, এমন সময় মৃগেন দত্ত এলেন। তাঁর কাছেও ডগ্‌লাসের উপর গুলিবর্ষণের কথা শুনলাম। তাঁকে সাইকেলে পাঠালাম বাড়ির দিকে। ভাবলাম, প্রভাংশু যখন ধরা পড়েননি তখন তাঁর কাছ থেকে কোন খবর নিশ্চয়ই আসবে।...

সাঁঝ-বাতি জ্বলেছে। এমন সময় আমি বাড়ি ফিরেছি। ওদিকে বাড়ি ফেরার সময় ব্রজকিশোরের সঙ্গে মৃগেনের দেখা হয়। ইনি সেই ব্রজ, যাঁর বার্জ-হত্যা মামলায়-ই ফাঁসি হয়েছিল।

মৃগেনের মারফৎ ব্রজকিশোর সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, মাণিকপুর মহল্লার প্রবেশমুখের রাস্তায় ক্যালভার্টের নীচে রিভলভারটি লুকিয়ে

রেখে প্রভাংশু চলে গেছেন তাঁর মামা অমল বসুর বাড়িতে। অমলবাবু থাকেন ছোটবাজারে, শহরেরই অভ্যন্তরে।

আমি এ সংবাদে খুবই আশ্বস্ত হ'লাম। কারণ প্রভাংশুকে যদি কেউ কাজের সময় না চিনে থাকে, তবে মাতুলের আশ্রয় তাঁর পক্ষে মোটামুটি নিরাপদ।

মৃগেনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে রান্নাঘরে ঢুকে আমার মাতামহীকে নিয়ে হাল্কা ভাবে ঠাট্টাতামাসা শুরু করলাম। তিনি তখন লুচি ভাজছিলেন।

এমন সময় রাস্তার দু'দিক থেকে অনেক গুলো ভারী বুটের শব্দ এলো। দিদিমাকে বললাম : "আবার আমাকে জেলে যেতে হবে।" বলেই আমার কাছে গচ্ছিত পার্টির ৩৬০৲ টাকা একটি রুমালে বেঁধে তাঁর হাতে দিয়ে ব্যক্ত করলাম : মৃগেন আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার না হলে তাঁকে টাকাটা দিয়ো। যদি অন্যরূপ হয়, তবে আমার যেকোন বন্ধু (যাঁকে তুমি নিজের হাতে কখন খাইয়েছ) তোমার কাছে এসে টাকা চাইলে তাঁকেই ওটা দিয়ে দিয়ো।"

কথা শেষ হতে না-হতেই পুলিশ-বাহিনী আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলল। অফিসারদের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়া পরান হল। চলল সারা বাড়ি জুড়ে তল্লাসী। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না।

দিদিমার খাবার পড়ে রইল। পুলিশের বন্দী হয়ে থানার পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু মন খুশীতে ভরপুর। মৃগেনকে ওরা ছোঁয় নি! মনে হল, দলের অসমাপ্ত কাজ সমাপিত করার জন্যই বুঝি বিধাতার আশীর্বাদে মৃগেন এ-যাত্রা বাইরে রয়ে গেল।...

থানায় আমাকে একটি সেলে রাখা হল। সেই সেলেরই উল্টো দিকে অপর একটি সেলে রাখা হয়েছে প্রদ্যোৎকে। অন্ধকারেই বুঝলাম আরো অনেককে ধরে আনা হয়েছে।

প্রদ্যোতের উপর এবং আমার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার

বর্বর পুলিশ করেছিল তার বিবরণ এখানে দেব না। আগ্রহী পাঠক সে-কাহিনী 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে (পৃঃ ৯৫-৯৮) বিশদ রূপে লিপিবদ্ধ পাবেন। তা'ছাড়া তৎকালীন দৈনিক পত্রপত্রিকায় ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল্ এবং হাইকোর্টের বিচার কালেও এ সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এখানে বলার চেষ্টা করেছি শুধু সেই কথাই, যা এখনো সর্বজনবিদিত নয়।

"প্রচণ্ড মারেব চোটে সংজ্ঞাহীন ফণী দাসকে তো মৃত বলেই পুলিশ ধরে নিয়েছিল। তার পর বহু চেষ্টায় তাঁকে বাঁচান হল।..." তাইতো আমাকে থাকতে হল অনেকদিন হাসপাতালে পুলিশ-পাহারায়। একটু ভাল হতেই প্রথম যেদিন আমাকে কোর্টে আনা হল, সেদিন শুরুতে কোর্ট-ইন্সপেক্টরের ঘরে প্রদ্যোৎ ও আমাকে একই সঙ্গে রাখা হয়েছিল। আমাদের পরস্পর কথাবার্তা বলার সুযোগও দেওয়া হল, অবশ্য পুলিশেরই নিজস্ব মতলবে।

সে যাই হোক, আমরা কিন্তু পবস্পরকে কাছে পেয়ে হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেলাম।

এসময়ই প্রদ্যোতের মুখে শুনলাম যে তাঁর রিভলভার থেকে একটি গুলিও বেরোয় নি। প্রভাংশুর গুলিতেই ডগ্‌লাস খতম হন। প্রভাংশু কার্য অন্তে প্রদ্যোৎকে হাত ধরে টান দিতেই উভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে থাকেন। কিছুদূর যাবার পর দু'জনে দু'দিকে ছুটে যান।

কিন্তু ভুলক্রমে প্রদ্যোৎ গুরুট্রেনিং স্কুলের একটি চালাঘরে ঢুকে পড়েন। দূর থেকে সাহেবদের দেহরক্ষীরা অবিরাম গুলি চালাচ্ছিল।

প্রদ্যোৎ ঐ চালাঘর থেকে উঁকি মেরে দেখলেন যে কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। তখন তাদের দিকে রিভলভার তাক্ করে সুমুখের তারের বেড়া টপ্‌কে পার হবার উপক্রম করতেই তাঁর পরনের ধুতি বেড়ার কাঁটায় আটকে গেল। ধুতি

কাঁটামুক্ত করবার মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে একটি পাথর এসে তাঁর গণ্ডদেশে আঘাত দিল।

প্রদ্যোৎ সেই আঘাতে ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলেন। একজন দেহরক্ষী ছুটে এসে তাঁর উপর চেপে বসল। এর পর প্রহারের পালা। বন্দীর উপর বীরত্ব দেখানর সে এক জঘন্য অত্যাচার।...

ঐ একদিন ব্যতীত প্রদ্যোতের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎলাভ ঘটে নি।

প্রদ্যোতের বিচার এবং তাঁর ফাঁসির ইতিহাস আজ আর কারো অজানা নেই। আমরা জানতাম যে, প্রদ্যোতের জীবনে দুর্বল মুহূর্ত কখনো আসবে না। কারণ, সকল দিক থেকেই এই কিশোর ছিলেন অনন্যসাধারণ।

কিন্তু কারাকক্ষের মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যেই আমাদের এত দেখা আবাল্য-বন্ধু প্রদ্যোৎ যে কোন্ স্তরে উঠে গিয়ে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, তা' জানতাম না। জানলাম সেই কথা জেলখানা থেকে লিখিত তাঁর পত্রগুলো পড়ে। এই পত্র পড়েই আরো বুঝলাম, প্রদ্যোৎ ছিলেন সকল দিক দিয়েই দীনেশদার সার্থক উত্তরসাধক!...

আমাদের কারো বিরুদ্ধেই পুলিশ মামলা চালাতে পারল না। নরেন দাস, ক্ষিতি সেন, আমি—আমরা সকলেই ডগলাস-হত্যা-মামলা থেকে মুক্তি পাবার সাথে সাথেই 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্'এ ডেটিনিউ হ'লাম। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আমাকে পুলিশ-পাহারায় রাজসাহী-সেন্ট্রাল-জেলে সোগ্রিগেট্ করা হল। তারপর বিনা-বিচারে বন্দীর জীবন কাটিয়ে গেলাম নানা জেলে, বছরের পর বছর। পরে আমাকে পাঠান হয়েছিল দেউলি বন্দী-শিবিরে সেখানে নির্জনতা অল্প। ছিল বহু জনের সমাবেশ। কিন্তু নির্জন

মুহূর্তও খুঁজে পাওয়া যেত। তখন মনের অঙ্গনে অলক্ষ্যে এসে দাঁড়াতেন প্রদ্যোৎ, অনাথ, মৃগেন, ব্রজ, নির্মল, রামকৃষ্ণ ঐ দীনেশদাকে ঘিরে। তাঁদের ওষ্ঠে বুঝি একটি-ই প্রশ্ন: বল, "দিবে কি বলিদান হে?"...

শ্রীফণীন্দ্রকুমার দাস

পাচাড়ীপুর,
মেদিনীপুর

প্রথমে প্যেডি, তারপর ড্‌গলাস্‌। এবার হ্যাট্রিক। সে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলাজজ বার্জ নিধনের মধ্য দিয়ে।

মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। দিতে হয়েছিল অফুরন্ত প্রাণ সম্পদে ভরপুর পাঁচ পাঁচটি তরুণ প্রাণ। তাঁদের মধ্যে অনাথ বন্ধু পাঁজা এবং মৃগেন দত্ত ঘটনা স্থলেই প্রাণ দিয়েছিলেন রক্ষী-বাহিনীর গুলিতে। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় এবং নির্মল-জীবন ঘোষ প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন ফাঁসিমঞ্চে।

সেই আবিস্মরণীয় কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ প্রবীন বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জীব রায়ের মুখ থেকেই তুমি শোন। এ-ঘটনার নেপথ্য নায়ক-দের মধ্যে শ্রীরায়ের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৩ সাল। আবার ঘুরে আসছে মেদিনীপুরের 'এ্যানিভার্সারি ডে'। ম্যাজিস্ট্রেট-নিধনের এ্যানিভার্সারি ডে।

আমরা 'এপ্রিল' মাসটাকে ঐ নামেই নিজেদের মধ্যে অভিহিত করতাম। পর পর ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে দুইটি জেলাশাসক এই শহরে ধরাশায়ী হয়েছেন। তৃতীয়টিকে ১৯৩৩ সালের এপ্রিলেই শেষ করতে হবে। চলছে তার প্রস্তুতি।

এমন সময় হঠাৎ 'বি-ভি'-দলের উপর এল দারুণ আঘাত।

এ আঘাত আকস্মিক। প্রফুল্লদার বাসা ছিল বরাহনগরে। তাঁর ভাগ্নী হেলেনা বল (দত্ত) এসেছেন মামার বাসায়। হেলেনা ছিলেন শ্রীসংঘের মহিলা মহলের প্রথম সারির কর্মী। পুলিশের বিশেষ নজর থাকলেও প্রফুল্লদার (দত্ত) বাসায় আসবার সময় তাঁকে তারা চিনতে পারে নি। ওয়াচারদের ধারণা হল যে চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রখ্যাত বিপ্লবিনী কল্পনা দত্তই ওখানে আস্তানা নিয়েছেন। আমরা অবশ্য এ তথ্য পরে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম।...

এই সময়টাতেই হরিপদ ভৌমিক ও কামু (কামাখ্যা ঘোষ) এসেছেন মেদিনীপুর থেকে। দেখা করবেন কেন্দ্রীয় এ্যাকৃশান্-স্কোয়াডের অন্যতম নেতা সুপতিদার (রায়) সঙ্গে। সুপতিদা ১৯৩০ সাল থেকেই পলাতক। পুলিশের কাছে একটি বিস্ময়কর বিভীষিকা।

সুপতিদার সঙ্গে তৎকালে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ভার ছিল শৈলেন নিয়োগীর।

শৈলেন ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। হিন্দু-হোস্টেলে থাকতেন। গোপন সেন্টারগুলোর খবরাখবরের ব্যবস্থা সাধারণত তাঁর মাধ্যমেই হতো। কর্মীদের পরস্পরের সাথে দেখা,

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন নীরদ দত্তগুপ্ত ও আমি নীরদ দত্তগুপ্ত দলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ সভ্য।

১৯৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি। প্রফুল্লদার (দত্ত) বরাহনগরের বাসায় আসবেন সুপতিদা। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে হরিপদ ও কামাখ্যা ঘোষের।...প্রফুল্লদাকে আমরা ফুলদা বলে ডাকতাম। ফুলদা এ্যাক্‌শান-স্কোয়াডের নেতৃস্থানীয় রূপেই বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছিলেন মেদিনীপুর-কেন্দ্রের সংগঠন দেখাশোনা করার।

এবার উক্ত এ্যাক্‌শান স্কোয়াডের কথা সামান্য বলতে হচ্ছে। আমাদের দল যখন ১৯৩০ সালে ওভার্ট-এ্যাক্ট্ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন দল-নেতৃত্ব পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করলেন একটি গোপন বাহিনী। সে-বাহিনীর পরিচালকবৃন্দ ছিলেন শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত এবং তাঁদের কনিষ্ঠ বন্ধু নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায়। এই নেতৃবৃন্দ অণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেছেন। শুধু প্রফুল্লদা দলের কাছেও সিক্রেট্ থাকাতে পলাতক হন নি।

গোপন-নেতৃত্বের প্রধান পরামর্শ-কেন্দ্র ছিল ৭নং ওয়ালিউল্লা লেনে (ওয়েলেসলি স্কোয়ারের সন্নিকট), এবং এই নেতৃত্বের পরম সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

পূর্বেই বলেছি মেদিনীপুর সংস্থা পরিচালনার ভার পড়েছিল প্রফুল্লদার উপর। কারণ তিনি 'সিক্রেট্' অথচ পলাতক নন। ভাল মানুষটির মত সর্বত্রই চলাফেরা করেন।

স্থির হল আমি পৌঁছে দেব কামাখ্যা ঘোষকে ফুলদার বাসায় বরাহনগরে। কামুকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথা থেকে বাসে তুলে নিয়ে আমি যাব।

যথাসময়ে দু'জনেই নির্দিষ্ট স্থানে চলে এসেছি। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে নীরদ দত্তগুপ্ত এসে আমাকে উক্ত কার্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই কামুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন বরাহনগর।

আমি চলে এলাম প্রতাপাদিত্য রোডে আমার মামা অরবিন্দ বসুর বাসায়। সেখানেই আমার আস্তানা।

ঐদিনই বিকেলে ছিল একটি এনগেজমেণ্ট। অস্ত্র-সংগ্রহের ব্যাপার। যেতে হবে নীরোদবাবু ও আমাকে। সঙ্গে থাকবেন প্রিয় সেন আমাদের সশস্ত্র দেহরক্ষী রূপে। স্মাগলিং এর ব্যাপারে কোন নূতন সোর্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার কালে নিরাপত্তা বোধে আমরা সশস্ত্র-রক্ষী সঙ্গে রাখতাম।

বিকেল সাড়ে তিনটা। পূর্ব কথা মত যথাসময়ে আমি গেলাম নীরদ দত্তগুপ্তের ভবানীপুরস্থ ৫নং বিজয় মুখার্জি লেনের বাসায়। কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন নীরদবাবু নন, দলের অপর একটি কর্মী গোপাল গুহ। শুনলাম তাঁর কাছে যে, নীরদবাবু বাড়ি ফেরেন নি। তিনি দিলেন এক নিদারুণ সংবাদ—প্রফুল্ল দত্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন, সাথে তাঁর ভাগ্নী হেলেনা বলও। পুলিশ হেলেনা দেবীকে 'কল্পনা দত্ত' মনে করেই সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করেছে, এবং তথাকথিত 'কল্পনা দত্তে'র আশ্রয়দাতা রূপেই প্রফুল্ল দত্তের হাতে হাতকড়ি পরিয়েছে।...

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল! ভাবলাম প্রফুল্লদা তো ধরা পড়েছেন. কিছু করবার নেই। কিন্তু যাঁদের বরাহনগরের বাসায় দেখাসাক্ষাৎ করার কথা তাঁদেরতো পুলিশ ফাঁদে ফেলবে! 'কল্পনা দত্ত'কে ধরার আনন্দে পুলিশতো বিহ্বল—এবার যে-ই যাবে ঐ বাসায় তারই রক্ষা নেই।

সবার চেয়ে আমি চিন্তিত সুপতিদার জন্য। এই মানুষটি অমন সহজে ধরা পড়লে কি হবে?

সুপতিদা যে গোপন-কাজে পার্টির নয়নমণি! সব্যসাচী'র কিছু ছোঁয়া তাঁর রক্তে লেগে আছে।

বিহ্বল অবস্থায় মুহূর্ত অপেক্ষা করতেই হঠাৎ দেখতে পেলাম বিজয় মুখার্জি লেনের ওমাথায় পুলিশ-পরিবৃত হয়ে স্বয়ং নীরদ দত্ত-

গুপ্ত এগিয়ে আসছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ঠিক আমার আশঙ্কা মত। নিয়ে আসছে তাঁকে স্বগৃহে—সার্চ হবে বাড়িঘর।...

গোপালকে নিয়ে আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটে পালালাম। গোপালকে কোথায় কি বলতে হবে এবং কি কি কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দিলাম। তাঁর প্রথম করণীয় হল দলের অন্যতমা নেত্রী মীরাদি অর্থাৎ মীরা দত্ত-গুপ্তের বাসায় পৌঁছে তাঁকে সতর্ক করা। কারণ তাঁর ভ্রাতা বিশেষ অসুস্থ থাকায় বি-ভি-র কতিপয় কর্মীই রাতে তাঁর নার্সিং করতেন। তাঁদেরকে বাড়ির গাড়ি পাঠিয়ে সন্ধ্যার পর যাঁর-যাঁর গৃহ থেকে তুলে আনা হত। তাঁদের মধ্যে থাকতেন মাখনদা (ডঃ মাখন দত্ত)। মীরাদি যাতে বন্ধুদেরকে যথাযথ সংবাদ পাঠান, এবং নার্সিং-এর জন্য তাঁদের না আনান সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত হতে হবে।...

এদিকে অন্য ব্যাপারে দ্বিধায় পড়লাম আমি। সন্ধ্যায় অস্ত্র-সংগ্রহের পরিকল্পনায় জড়িত হওয়া উচিত কিনা! নূতন সোর্স্—যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত কি?...

ভাববার সময় নেই। নির্দিষ্ট ক্ষণ এসে গেল। শেষ পর্যন্ত স্মাগ্লারের হাতের অস্ত্রটির আকর্ষণেই যেন বেরিয়ে পড়লাম! নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন সশস্ত্র প্রিয় সেনগুপ্ত। প্রত্যাশিত ব্যক্তিটি এল। লেনদেন হয়ে গেল। অস্ত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে আমরা চলে এলাম।...

সংবাদ পেয়ে গিয়েছি যে প্রফুল্লদার বাড়িতে সত্যি পুলিশ ফাঁদ পেতেছিল। সেই ফাঁদে যাঁরা ধরা পড়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সুপতিদা (রায়), নীরদ দত্তগুপ্ত, বিনয় সেনগুপ্ত, হরিপদ ভৌমিক, কামাখ্যা ঘোষ প্রমুখ।

ইলিশিয়াম্ রো'তে আজ 'আই-বি' ও 'এস-বি'র পরমোৎসব! কিন্তু আমাদের চোখের সুমুখে নাচছে কালো ছায়া।

আমি সাবধানতা অবলম্বন করে প্রতাপাদিত্য রোডের বাসায় ফিরে গেলাম না। কিছুদিন এখানে সেখানে পালিয়ে থেকে বুঝতে হবে যে পুলিশের নজরে সত্যি আমি পড়েছি কিনা।...

মেদিনীপুরের কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন 'তৃতীয় এ্যানিভার্সারি' পালনের সংকল্পে। প্রভাংশু পাল দলের 'প্রাইজ বয়'। দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ড দান করে অতি কৌশলে তিনি পালিয়ে এসেছেন। পুলিশ তাঁকে কোন ভাবেই খোঁজ করতে পারে নি, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে তাদের কোন রিপোর্ট-ই ছিল না।

প্রভাংশু এখন কলকাতায়ই থাকেন তাঁর বাবার কাছে। বাবা উত্তর কলকাতায় ডাক্তারী করেন। প্রভাংশু কলেজের ছাত্র। মেদিনীপুরের সঙ্গে প্রভাংশু নিয়ত যোগাযোগ রাখছেন। প্রয়োজনে তাঁর যাতায়াত খড়গপুর পর্যন্ত। সেখানে মেদিনীপুরের ছেলেরা এসে তাঁর সঙ্গে পূর্ব সংবাদ মত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু মেদিনীপুরে প্রভাংশু যান না নিরাপত্তার দিক থেকে।

'ঠাকুর' অর্থাৎ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী অবশ্য কলকাতায় আসাযাওয়া করেন। 'ঠাকুর' নামেই ব্রজকিশোর পরিচিত ছিলেন বন্ধুমহলে। মেদিনীপুর সংগঠনের পুরোভাগে তখন এই তরুণ। অমন একটি দুঃসাহসী, বিচক্ষণ ও সুদক্ষ সংগঠন 'বি-ভি'-র জগতেও খুব সহজলভ্য ছিল না।...

ইতিমধ্যে আমিও বুঝেছি যে পুলিশের নজরে আমি নেই। তাই ফিরে এলাম প্রতাপাদিত্য রোডের বাসায়। অবশ্য এ-সবই করা হচ্ছিল দলনেতা যতীশ গুহের নেতৃত্বে। দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এক যতীশদাই পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে ছিলেন। কাজেই সর্বদায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। নেতৃত্বের সকল গুণই তাঁর

ছিল। বিপ্লবী জগতে প্রথম সারির নেতা রূপেই তিনি ঐ দুঃসময়ে অভূতপূর্ব কর্মকীর্তি রচনা করে গেছেন।

যতীশদা আদালতে নতুন উকিল। বাড়িতেই চেম্বার। পুলিশ তাঁকে বুঝতে পারে না। কোন রিপোর্ট নেই তাঁর বিরুদ্ধে। সন্দেহবশে তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

এই যতীশদা-ই এখন আমাদের সংগঠনের সকল দায়িত্ব বহন করছেন। তাঁরই নির্দেশে কি ভাবে প্রথমে আমি 'বেণু'-প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হই, এবং ক্রমে মেদিনীপুর-সংগঠনেরও সংস্পর্শে আসি তা এখানে বলা প্রয়োজন।

আমি শুরুতে ঢাকা-কেন্দ্রের কর্মী ছিলাম। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে পারিবারিক কারণে আমি কলকাতা চলে আসি, এবং প্রতাপাদিত্য রোডে মামার বাসায় আস্তানা নেই।

ভূপেনদার (রক্ষিত-রায়) আমলে, ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত, 'বেণু'-আপিস ছিল ৯৩-১-এফ, বৈঠকখানা রোডে। তারপরই পুলিশের উপদ্রবে 'বেণু'র প্রেস উঠে আসে ঝামাপুকুরে। তার নাম 'যুগমন্ত্র প্রেস'। এর মধ্যে 'লোম্যান্-হডসন্ এ্যাক্শান' হয়ে গেছে। ফলে বেণুর উপর কঠোর নির্যাতন শুরু হয়, এবং ঝামাপুকুরের বাড়ি ছেড়ে প্রেসটিকে তুলে আনতে হয় গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেনের এক গৃহে। প্রেসের নাম পাল্‌টে দিতে হয়েছে। এবার তার নামকরণ হল 'বাসন্তী প্রেস'।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও হল না। কাজেই প্রেস পুনর্বার উঠে গেল কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে, ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে।

আমাকে যতীশদা যখন বেণু-প্রেসের ভার নিতে বললেন, তখন আপিস ও প্রেস ছিল গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেনে।

বেণুর ম্যানেজমেণ্টে ছিলেন ইন্দু সরকার। ভূপেনদা গ্রেপ্তার হবার পর দল কর্মীদের উপর সব দায়িত্ব এসে গেল!

বেণু-সম্পাদনা, বেণুর কর্মাধ্যক্ষতা এবং বেণুর প্রেসটি পরিচালনার দায়িত্ব কয়েক জনকে গ্রহণ করতে হল। যতীশ গুহ, অশোক সেন, (বর্তমানে ভূতপূর্ব হাইকোর্ট জাস্টিস্) নিলেন কাগজ সম্পাদনার অর্থাৎ সম্পাদকীয় লেখার সম্পূর্ণ ভার। তাঁদের সাহায্য করতেন শচীন ভৌমিক। এঁরা তিনজনেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পাণ্ডিত্য ছিল তিনজনেরই প্রচুর।

প্রথমে 'সম্পাদক' রূপে কাগজে নাম ছাপা হল সুনীল সেন-গুপ্তের। কিন্তু কিছু রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। সুনীলদা জেলে যেতেই ১৯৩১ সালে তৃতীয় 'সম্পাদক' রূপে প্রসন্ন পালের নাম ছাপা হল। প্রসন্ন ও আমি প্রায় একই সময়ে 'বেণু'র সঙ্গে যতীশদার নির্দেশে যুক্ত হই। বেণুর সর্বময় দায়িত্বভার যতীশদাকেই বহন করতে হত।...

প্রথমেই বলেছি যে আমি ভার পেলাম বেণুর প্রেস পরিচালনার। ইন্দু সরকার পুরাতন কর্মী। ভূপেনদার আমল থেকেই বেণুর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বেণু-আপিসেই ভূপেনদার সঙ্গে ইন্দুবাবু থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে আরো থাকতেন মাখনদা (মাখন দত্ত), মণিদা (মণি সেন), সুধীরদা (সুধীর ঘোষ) প্রমুখ। এ ছাড়া রবিদাস দত্তও (মেজদা) থাকতেন তখন বেণু-আপিসে।

শুনেছি ৯৩-১-এফ্ নম্বরের (বৈঠকখানা) বাড়িটি ভূপেনদাদের আমলে জমজমাট ছিল। পার্টির কেন্দ্রস্থল শুধু নয়, কর্মস্থল ছিল ঐ বেণু-আপিস।

বাঙলার সমগ্র জিলার কর্মীদের আনাগোনায় মুখরিত ঐ স্থানে বহুজনের সমাগত হত। এই জনসমাগমে বিভিন্ন বিপ্লবী-দলের কর্মী ও নেতারা শুধু নন, বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদেরও আনাগোনা ছিল।

হেমচন্দ্র ঘোষ (বড়দা), সত্যগুপ্ত (মেজর গুপ্ত), রসময়দা (শূর) প্রমুখ দল-নেতৃবৃন্দ প্রতিদিনই একবার অন্তত বেণু-আপিসে আসতেন। ঢাকা থেকে সুপতিদারা এসে এখানেই উঠতেন।

হাঁ, ইন্দু সরকার ছিলেন বেণুর পুরাতন কর্মী। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁকে ভার দেওয়া হল 'বেণু'র কার্যাধ্যক্ষের। অবশ্য দলের প্রত্যেকটি কর্মী (ছোটবড় নির্বিশেষে) আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। এছিল বিরাট এক পরিবারের একটি যৌথ-কর্মযাত্রা।

কী আনন্দে ও নিষ্ঠায় এবং অদ্ভুত আবেগে যে আমাদের দিনগুলি কেটে যেত 'বেণু'কে ঘিরে, তা' ভাবতে গেলেও এখন অপূর্ব আনন্দ পেয়ে থাকি। শুরু থেকেই বেণুর জন্য প্রবন্ধাদি ও গ্রাহক-সংগ্রহের ব্যাপারে নীরোদ দত্তগুপ্তের অক্লান্ত অবদান একান্তই উল্লেখযোগ্য।

বেণুর কাজকর্ম নিয়ে বিষম ব্যস্ত থাকা কালেই যতীশদার নির্দেশে আমি বিদ্যাসাগর কলেজে নৈশ-বিভাগে বি-কম্ ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমাদের পার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটার দাম দিতেন। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে নির্দেশ মানতে হল। অবশ্য বাইরে থাকা কালে ডিগ্রিপ্রাপ্তি আমার ঘটে নি। দেউলি-বন্দীনিবাস থেকেই ১৯৩৬ সালে ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ আমার হয়।

মেদিনীপুরের কাজকর্ম বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রজ সংগঠন-কার্য চালাচ্ছেন একান্ত দক্ষতার সহিত। প্রভাংশু কলকাতায় কর্মব্যস্ত। যতীশদা এবং ব্রজকিশোরের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ তাঁর। আমরা যেকোন ব্যাপারে মেদিনীপুরের সঙ্গে সংযোগ করার জন্য সাধারণত প্রভাংশুকে পাঠাতাম। প্রভাংশু খড়গপুর অবধি গিয়ে কালু (অমলেন্দু) দাশগুপ্তের সঙ্গে কণ্টাক্ট্ করতেন 'ওয়াই. এম্. সি, এ'র মেসে। কালু রেলে চাকুরি করতেন এবং থাকতেন সেই মেসেই। কালুই মেদিনীপুরে

ব্রজকে পৌঁছে দিতেন খবরাখবর, অথবা তাঁকে নিয়ে আসতেন খড়্গপুরে প্রভাংশুর কাছে।

আমিও খড়্গপুরে কালুর কাছেই যেতাম এবং তাঁরই মাধ্যমে ব্রজদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মেদিনীপুর শহরে ঢুকতাম। এ-ছাড়া ব্রজও বহুবার কলকাতা এসেছেন যতীশদা বা আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। এভাবেই মেদিনীপুর-সংস্থার দৈনন্দিন খবর আমাদের নখদর্পণে থাকত।

এই সময় আমিই ব্রজকে বললাম মেয়েদের মধ্যেও কাজ করতে।

পার্টির বিশিষ্ট কর্মী চন্দ্রশেখর সেনগুপ্তের ছোট ভাই শান্তি সেনগুপ্ত ও একটি দুর্দ্ধর্ষ কর্মী। ব্রজকিশোরের মত শান্তিও মেদিনীপুর-কলকাতা যাতায়াত করতেন সংগঠনের নানা দায়িত্ব নিয়ে। আমি শান্তিকেও অনুরূপ ব্যবস্থা করতে বললাম।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁরা দু'চারটি মেয়েকে দলভুক্ত করে ফেললেন। তাঁদের মধ্যে উমা সেনের নাম উল্লেখ করা যায়। উমা পার্টির সদস্য অমর (তিনু) সেনের বোন। তিনু সেনের মাধ্যমেও আমরা মেদিনীপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।

এই মহিলা-সংগঠনেব প্রস্তাবটি দেবার পেছনে আমার যে সশ্রদ্ধ মন সক্রিয় ছিল, তার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। এখানে তার উল্লেখ করব।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস। বেণু-প্রেস চলছে তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে এক বাড়ির একতলার দু'খানা ঘর নিয়ে। একত্রিশ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরি কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্সকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সারা ভারত বিস্ময়ে বিহ্বল। দুইটি কিশোরী-অগ্নিশিখার আলোকে উজ্জ্বল তরুণ-ভারতের মূর্তি।

এই সময় দল-নেতাদের কাছ থেকে আমাদের প্রেসে আদেশ এল শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরির ফটো ছাপানর। উদ্দেশ্য—সারা বাঙলায় ওগুলো ছড়িয়ে দেওয়া। তাঁদের চমৎকার দু'টি ছবি পেলাম। ছবির ব্লক্ করা হল। তার ক্যাপশান্ ইত্যাদির পাণ্ডুলিপিও আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। সারা রাত ইন্দু সরকার ও আমি লেখাগুলো কম্পোজ করে ট্রেডেল্ চালিয়ে, ছবির পর ছবির ইস্তাহার ছাপিয়ে যেতে থাকলাম।

আমাদের কিশোর সহকর্মী রবি ভট্টাচার্যের (বর্তমানে কলিকাতা 'মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক) কাজ ছিল এটাসেটা এগিয়ে দেওয়া—অর্থাৎ তিনি ছিলেন হেল্পার। রবি ওরফে 'বরুণ' আমাদের প্রেসে অবস্থান করেই কম্পোজের কাজ শিখছিলেন। দলের কর্মীদের এসব কাজ না শেখালে প্রেসের কণ্ট্রোল থাকে না।

যা'হোক এই ভাবে হাজার-হাজার ছবি ছাপিয়ে পাঠান হল বাঙলার বিভিন্ন জেলায়। তৎপর একই নির্দিষ্ট দিনে সর্বত্র বিলি হয়ে গেল সেই ছবির ইস্তাহার।

এই ছবিটি প্রকাশিত হবার পর 'বেণু'র-প্রেসের উপর (তৎকালীন নাম 'বাসন্তী প্রেস') পুলিশের নতুন করে আবার দৃষ্টি পড়ল। যদিও ইন্দু সরকার ব্যতীত বেণু-আপিসে তখন পুরাতন লোক কেউ ছিলেন না, তবু পুলিশ সন্দিগ্ধ ও সচকিত হয়ে উঠল।

আমরা তখন স্থির করলাম যে আমরা প্রেসে সারাদিন কাজকর্ম করলেও আস্তানা রাখব অন্যত্র। বরুণ (রবি ভট্টাচর্য) ও আমি উঠে এলাম চোরবাগানে এক বিহারী ব্যবসায়ীর বাড়িতে একখানা নীচের তলার ঘর ভাড়া নিয়ে।

চোরবাগানের এই বিরাট বাড়ির একতলায় অনেকগুলো ঘর। অবাঙালী-ভাড়াটে ভরা সেই ঘরগুলো। কাজেই নানাদিক থেকে

আমাদের পক্ষে ভাল আস্তানাই হল। কারণ পুলিশের নজর সাধারণত এসব এলাকায় তেমন একটা থাকার কথা নয়।

আমাদের ঘরের পাশেই ছিল একজন বিহারী মোটর-ড্রাইভার ও তার কিশোরী স্ত্রী। স্ত্রীটি অতিসাধারণ দেহাতী মেয়ে।

একদিন দেখলাম মেয়েটা চাপা-কণ্ঠে কাঁদছে, তার পাশে বসে আছে একটি বৃদ্ধা। আমার স্বভাবতই এদের কারো সাথেই বাক্যালাপ ছিল না। তবু বৃদ্ধাকে মেয়েটির কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বৃদ্ধা বলল—ওর স্বামীটা ছ'দিন বাড়ি আসে না। ছন্নছাড়া ড্রাইভারটা তার স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। বেচারা আজ ছ'দিন কিছু খায় না—হাতে একটা পয়সাও নেই।

আমি বুড়ির হাতে দু'টো টাকা দিলাম। এই পর্যন্ত। এ ছাড়া পাশের এই পরিবারটির সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই হয় নি।···

এদিকে শান্তি ও সুনীতিদের ছবিগুলো শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার পরই পুলিশ জানতে পেরেছিল যে ওসব আমাদের প্রেসেই ছাপা হয়েছে। তাই সহসা একদিন পুলিশ এসে ঘেরাও করল আমাদের চোরবাগানের আড্ডা। পাশের কয়েকটা ঘর মামুলি সার্চ হচ্ছে। আমি এদিকে তৈয়ের হয়ে আছি। আমি বুঝেছি যে, আমার ঘরই ওদের টার্গেট্, এবং আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করবে।

এমন সময় দেখি আমার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে দীর্ঘ গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একটি মহিলা ঢুকছেন।

আমি হতচকিত। ভাবছি, এ আবার কি?

মুহূর্তে মহিলার ঘোমটা কিছুটা উঠে গেল। ভাঙা-বাঙলায় বলছেন: 'আমি জানি ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। আপনার কাছে কিছু থাকেতো ওসব আমাকে দিয়ে দিন। আমি নিজের কাছে ওসব লুকিয়ে রাখব।'

আমি হতভম্ব। পুলিশের এ আবার কোন্ ফন্দি? মেয়েদেরও দেখছি ওরা কাজে লাগাচ্ছে।

মহা বিপদে পড়লাম। আমি নিশ্চুপ। মেয়েটি আবার বললেন: 'ওরা এল বলে। দিয়ে দিন যদি কিছু থাকে।'

আমি তবুও নিরুত্তর। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি অজ্ঞাত ঐ মহিলার দিকে। কে এই মহিলা? কোন জন্মেও এঁকে আমি দেখিনি তো?

হঠাৎ মহিলার ঘোমটা সম্পূর্ণ সরে গেল। বিস্ময়ে দেখি তাঁর দু'টি চোখে অশ্রুধারা।

ব্যাগ্রব্যাকুল কণ্ঠে বললেন: 'বিশ্বাস করুন আমাকে। আপনার ক্ষতি করতে আসিনি। ওরা এসে যাচ্ছে। সময় নেই।'

আমি তখন আস্তে আস্তে লুকিয়ে-রাখা শান্তি-সুনীতির ছবির ব্লক ও ছবির অরিজিন্যাল্ কপি মহিলার হাতে তুলে দিলাম। ত্রস্ত তিনি বেরিয়ে গেলেন।···

তাঁর চলে যাবার দু'এক মিনিট পরেই পুলিশ-ইন্সপেক্টর আমার ঘরে ঢুকে প্রচুর তল্লাসি চালালেন। পেলেন না কিছুই। তবু আমি গ্রেপ্তার হলাম। দিন পনের হাজত-বাস করার পর মুক্তি পেলাম। তারিখটি মনে নেই। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন দিন হবে।

চোরবাগানের বাসায়ই ফিরে এলাম। ফিরে আসবার কিছুক্ষণ বাদে দেখি পাশের ঘর থেকে সেই মহিলাটি বেরিয়ে এলেন। আমার হাতে গচ্ছিত-ধন তুলে দিয়ে একটু হেসে তিনি বিদায় নিলেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাবারও ফুরসৎ পেলাম না। অবাক হয়ে রইলাম। অবশ্য বুঝলাম, এই মহিলাই সেই 'কিশোরী বধূ' যে একদিন স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে ও ক্ষিধের জ্বালায় অমন কেঁদেছিল। তার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি। কাজেই আমার ঘরে যখন

সেদিন সে এসেছিল তখন তাকে আমি না-চেনা এক মহিলা বলেই গ্রহণ করেছিলাম। অধিকন্তু ঐ কিশোরীর কান্নার সঙ্গে আমার ঘরে-আসা মহিলার চোখের জলের তো কোন মিল নেই।

অতঃপর কোনদিনই মহিলাটির সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু নিয়ত আমি ভেবেছি যে এঁরাই যথাযোগ্য ট্রেনিং পেলে পুরুষের সংগে সমতালে এগিয়ে যেতে পারেন। এঁরা না এলে জাতির মুক্তি অসম্ভব। এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ব্রজ ও শান্তিকে আমি মেদিনীপুরে মেয়েদের সংগঠন-কার্যের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছিলাম।···

তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে প্রাণদণ্ড-দানের সিদ্ধান্ততো গৃহীত হয়েই আছে। এখন শুধু তাঁকে সুবিধেমত পাবার সুযোগের অপেক্ষা।

তিনু সেন (অমরেন্দ্র) এসেছেন আমার কাছে, মেদিনীপুর থেকে সংবাদ নিয়ে,—অস্ত্রশস্ত্রের তাগিদ ছিল তাঁদের। পুলিশের নজরে পড়েন নি এই সুশ্রী তরুণটি।

মেদিনীপুরের খেলার জগতে অমর সুপরিচিত, এবং বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র। আমার কাছে এক ফাইল সায়ানাইড্ ছিল। আগুন জ্বেলে তিনি তা পরীক্ষা করলেন। ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল। আমার বাসা ভর্তি লোক। সে এক কাণ্ড।···

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার কাছে শৈলেন কুণ্ডুর মিষ্টির দোকান। শৈলেন আমাদের দলের ছেলে, তা'ছাড়া মেদিনীপুর-শাখার বিশিষ্ট কর্মী ফণী কুণ্ডুর ভাইপো। তাঁর দোকানটি ছিল একটি সংযোগস্থল।

মেদিনীপুরের কর্মীদের সংগে ওখানে মেলামেশা হত। ওখানে সংবাদ দেয়া-নেয়াও হত।

এই সংবাদ-চালাচালির ব্যাপারে দু'চারবার শান্তি সেন এবং মুকুল সেন ও মেদিনীপুর থেকে আমার কাছে এসেছিলেন নানা সময়ে। তাঁরা-ও পুলিশের কাছে ছিলেন অজ্ঞাত। দু'জনের বাড়ি ঢাকার দিকে হলেও তাঁদের পরিবার ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে মেদিনীপুরের বাসিন্দা।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুর থেকে এল চমকপ্রদ একটি সংবাদ।

ব্রজকিশোর জানাচ্ছেন যে, মেদিনীপুর 'ট্রেজারি' থেকে লক্ষ টাকা হস্তগত করা সম্ভব।

– ট্রেজারার ছিলেন শান্তি সেনদের আত্মীয়। তিনি ষড়যন্ত্রে সামিল হতে রাজি হয়েছেন। তাঁর নাকে ক্লোরোফর্ম্-মাখা রুমাল চেপে ধরতে হবে। তৎপূর্বেই তিনি টাকার বাণ্ডিলগুলো সহজলভ্য স্থানে রেখে দেবেন।

অবশ্য অন্যান্য স্টাফ্ ও শান্ত্রীদের উপস্থিতি থাকছেই। প্রয়োজনে তাই অস্ত্র চালাতে হবে। অবশ্য এই কাজটির অব্যবহিত পরে বার্জকে তাক্ করাও কঠিন হবে না।

ব্রজ ও শান্তিদের অনুরোধ যে কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁদেরকে যেন গ্রীন্-সিগ্ন্যাল দেন। যতীশদার কাছেও মেদিনীপুরের বন্ধুরা সব কথা জানালেন।

যতীশদা বললেন: "বার্জ-এ্যাটেম্‌ট্ হল একটি রাজনৈতিক কাজ, আর ট্রেজারি-লুট হল পার্টির অর্থনৈতিক অভিযান। প্রথমটি হল অবশ্য করণীয়, দ্বিতীয়টি পারলে করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি পণ্ড হতে পারবে না।"

ছেলেরা বললেন: "বিশ্বাস করুন, আমাদের দু'টো কাজই সাফল্যের সহিত করার শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। আপনি শুধু আদেশ দিন।"

যতীশদা হেসে বললেন: "Heroes also require caution; যাক্, নিরঞ্জীব যাবেন সমস্ত ব্যাপার সরেজমিনে বুঝে নিতে। তাঁর রিপোর্ট পেলে আমি সবদিক ভেবেচিন্তে তোমাদের আমার অভিমত জানাব।"

যতীশদার আদেশে আমি মেদিনীপুর রওনা হলাম। তখনকার দিনে কোন তরুণের পক্ষে মেদিনীপুর যাওয়া বিপদের মুখে পা বাড়ান। সমস্ত শহর তখন আই-বি পুলিশের কলোনি। শহরবাসী পুলিশী-বিভীষিকার রাজত্বে সন্ত্রস্ত-জীবন কাটাচ্ছে। সমগ্র জিলার যুবক-দেরকে দেওয়া হয়েছে লাল, সবুজ ও শাদা কার্ড।

যাঁরা বেশি সন্দেহভাজন তাদের জন্য লাল কার্ড। মাঝারি সন্দেহজনকদের জন্য সবুজ কার্ড। যাঁরা সন্দেহজনক নয় তারা পেয়েছে শাদা কার্ড। যেকোন স্থানে যেকোন মুহূর্তে পুলিশের লোক চ্যালেঞ্জ করলে ঐ কার্ড না দেখাতে পারলেই হাজতবাস।

মোটরগাড়ির মত প্রাইভেট্ সাইকেলগুলোতেও নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশের নির্দেশে। দু'দুবার পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে বিপ্লবীরা জিলার 'মা-বাপ'কে খুন করেছেন—এবার আর তার সুযোগ থাকতে দেবেন না ব্রিটিশরাজ। আটঘাট বেঁধে পুলিশ তাই সর্বত্র বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে।...

মেদিনীপুরের বন্ধুদের নির্দেশ মত আমি নাবলাম খড়্গপুর। উঠলাম গিয়ে 'ওয়াই এম্ সি-এ'-র মেসে, অমলেন্দু (কালু) দাস গুপ্তের আশ্রয়ে। পূর্বেই বলেছি কালু ছিলেন রেলওয়ে কর্মচারী। ছিলেন 'বি-ভি'-র বিশ্বস্ত কর্মী এবং পুলিশের সন্দেহমুক্ত ব্যক্তি। মেস্বাসীদের কাছে অতি সাদাসিদে অথচ জমাটি লোক।

কিন্তু মেদিনীপুর শহরে তাঁর আত্মীয়স্বজন প্রচুর এবং তাঁদের

প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারই পুলিশের নজরে থাকায় কালু দাশগুপ্তের ভাগ্যেও জুটেছিল একটি 'লাল কার্ড'।

যা'হোক চতুর লোক এই কালু। তিনি একটি শাদা কার্ড ও যোগাড় করে রেখেছিলেন কলকাতার বন্ধুদের আনাগোনা ও চলাফেরা সহজতর করার উদ্দেশে।

কালুর কাছে যাওয়া মানেই মেদিনীপুর সংস্থাকে স্পর্শ করা। কালু খবর পাঠালেন ব্রজকে। ব্রজ এসে গেলেন।

খড়গপুর স্টেশনের অদূরে মালগাড়ি শেড্। মাঠের উপর দিয়েই চলে গেছে রেল্-লাইন। মালগাড়িগুলো কিছু সংখ্যক সব সময়ই আছে দাঁড়িয়ে। ওগুলোর ছায়ায় মাঠের মধ্যে বসে আলাপ হচ্ছে মেদিনীপুর ইউনিটের কর্মীদের সাথে।

ব্রজকিশোরই দু'দুজন করে কর্মীদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। গোপন আলোচনা। পার্টি সংগঠন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। অবশ্য একান্ত 'ইনার কোর্'-এর কর্মীদের সাথে 'ওভার্ট্ এ্যাক্টে'র সম্পর্কে সলাপরামর্শ ও হল। তৃতীয় ম্যাজি-স্ট্রেটকে এ্যাটেম্প্ট্ করা ও ট্রেজারি লুটের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করলাম।...

নির্মলজীবন ঘোষের কথা আজও মনে পড়ে। কী তেজোদীপ্ত ব্রাইট্ ছেলে। বললেন: "কেবল একটা 'জিনিস' দিন...দমাদম্ মেরে দেব।" এই নির্মলজীবনেরই দাদা যতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাসগুপ্ত ইতিপূর্বে প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডিকে যমালয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। সেটা ঘটেছিল ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল।

নির্মলজীবনের কথার রেশ টেনে ব্রজকিশোর বললেন: "পায়রা ঠিকই বলেছে, বড়বাবু। পায়রা আমাদের যে-সে পাখী নয়—সে বাজপাখী! হুকুম পেলে অস্ত্রও লাগবে না, নখে ছিঁড়ে আনবে শাদা শত্রুর প্রাণ।"

টিঁপার বন্ধুমহলে আমার নাম ছিল 'বড়বাবু', এবং নির্মলের ডাক নাম (বাড়ির) ছিল 'পায়রা'।

আমার আলাপ হল সেদিন রামকৃষ্ণ রায়, সনাতন রায়, কামাখ্যা ঘোষ (ছোট), সুকুমার সেন, অনাথ পাঁজা প্রমুখ কর্মীদের সঙ্গে।

ব্রজ দুঃখ করে বললেন : "মৃগেনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন না বলে তাঁর প্রাণে ব্যথা লেগেছে।"

পূর্বদিন মৃগেনের সাথে পরিচিত হবার প্রস্তাব ব্রজকিশোর করেছিলেন বটে। কিন্তু আমার তখন ধারণা ছিল যে মৃগেন নূতন রিক্রুট, তাই আলাপ করতে রাজি হই নি। অথচ 'গোরা'র নাম পূর্ব থেকেই জানতাম—কিন্তু তাঁরই পোষাকী নাম যে মৃগেন দত্ত তা জানা ছিল না।

ভুল ভেঙে গেল। পরদিনই ডাকিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। সোনার টুকরো ছেলে—মুহূর্তে আপন হয়ে গেলেন।…

মৃগেন 'গোরা' নামেই ঘরে-বাইরে পরিচিত। তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট-নিধন-পরিকল্পনায় গোরা পূর্ব থেকেই মনোনীত হয়ে আছেন।

প্রফুল্লদা ও সুপতিদা বাইরে থাকতেই ইন্দু সরকারের মাধ্যমে তাঁদের দ্বারাই তৃতীয় যেকোন এ্যাক্‌শানের জন্য গোরা (মৃগেন দত্ত) মনোনীত হয়ে ছিলেন :

গোরা কর্তব্য সম্পাদন করে, অল্পকালের মধ্যেই এই ধরণী ত্যাগ করার সংকল্পে স্থির ছিলেন বলে ইন্দু সরকারকে কোন এক আবেগ মধুর মুহূর্তে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হাতঘড়িটি স্মৃতিচিহ্ন রূপে। ইন্দুবাবুর কাছে আজও নিশ্চয় সংরক্ষিত আছে অমূল্য সেই স্মারকোপহার।…

খড়গপুরের কাজ শেষ হল। এবার যেতে হবে মেদিনীপুর শহরে।

সাইকেলে যাওয়াই স্থির হল। ট্রেনে যাওয়া নাকি মোটেই নিরাপদ নয়।

ইকালু এখন কাণ্ডারী। নিজের সাইকেলের সঙ্গে আরো একটি সাইকেল এবং আমার জন্যে একটি শাদা রঙের অহিডেন্টিটি কার্ড করলেন কালু দাসগুপ্ত।

খড়গপুর থেকে মেদিনীপুরের দূরত্ব ৮ মাইল। সাইকেলে মেদিনীপুরের নম্বর দেওয়া রয়েছে। পথে কসাই নদী (কংসবতী) পার হতে হল খেয়া-নৌকায়। সেখানেও 'আই-বি'র পাহারা। খেয়াওয়ালা ছিলেন 'বি-ভি'-র কর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত লোক। তাই তাঁর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল 'আই-বি'র পাহারাটিকে আমাদের পারাপার কালে খেয়াঘাট থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা।

ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নয়—এক পেট ভালমন্দ খাওয়াবার প্রলোভনে কিছু দূরের এক বাড়িতে তাকে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য এই অনুপস্থিতির সময়টুকুতে তার চাকরির কোন ক্ষতি হবে না, এ-আশ্বাস 'খেয়াওয়ালা'র কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল।...

কালু দাসগুপ্তের সঙ্গে আমি শহরের প্রয়োজনীয় স্থানগুলো ঘুরলাম। ট্রেজারি, বার্জ-এর বাংলো এবং আমাদের কাজের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘরবাড়ি ও নানা এলাকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলাম। পূর্ব আলোচনা অনুসারে ট্রেজারির চতুষ্পার্শ্ব বিশেষ নজর দিয়ে দেখলাম।

সব দেখেশুনে এবং ব্রজদের সাথে আলাপ করে বুঝলাম যে ট্রেজারির অর্থ লুট সহজ হলেও লুটের পর পালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। ওখানেই যুদ্ধ করে মরতে হবে।

দিনেদুপুরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পরিবৃত মেদিনীপুর শহরে এই এ্যাক্‌শান্ করে, বহু জীবন বলি দিয়ে, লক্ষ টাকা সহ আক্রমণকারীদের কেহ পালিয়ে এলেও অতঃপর 'বার্জ-এ্যাটেম্‌প্ট' শুধু কল্পনার বস্তু হয়েই থাকবে।

আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করলাম না। বন্ধুদের বললাম যে, আমি কলকাতায় পৌঁছেই যতীশদাকে আমার রিপোর্ট দেব।

তিনিই তাঁর তথা পার্টির সিদ্ধান্ত তাঁদের জানাবেন। ফিরে এলাম খড়গপুর।

চারদিন কেটে গেল খড়গপুরে। চলে এলাম কাঁথি। এটা অবশ্য সংগঠন-সফর। দীনেশ গুপ্তের প্রথম শিষ্যদের অন্যতম পরিমল রায় কাঁথিরই অধিবাসী। পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক ও প্রফুল্ল ত্রিপাঠী সর্বপ্রথম দীনেশ গুপ্তের প্রভাবে আসেন। প্রফুল্লবাবুকে কংগ্রেস-ফ্রণ্টেই কাজ করতে বলা হয়। পরিমল, ফণী ও হরিপদ দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য রূপে বিপ্লবীদল সংগঠনে তাঁর একান্ত সহায়ক হন। পরিমলদের চেষ্টায় কাঁথির সংগঠন উল্লেখযোগ্য ছিল।

আমি আশোক রায় নামে দলের একটি বন্ধুর বাড়িতে উঠলাম। অশোক ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। স্বভাবতই আমার অনেক ছোট। কিন্তু তাঁর বাড়িতে তাঁর মার কাছে আমার পরিচয় হল অশোকের ক্লাসের বন্ধু রূপে। মা পুত্রবন্ধুকে যে-আদরযত্নে সে সময় আপ্যায়িত করেছিলেন তার তুলনা কমই মেলে।

কাঁথিতে দিন সাতেক থাকতে হল। আলাপ হল দলের একনিষ্ঠ কর্মী জ্যোতিশ বেরার সঙ্গে। আলাপ হল রমাকান্ত মাইতি, বিপিন মাইতি প্রমুখ স্থানীয় প্রধান-সংঠকদের সঙ্গে।

কাঁথির দূর দূর অঞ্চল থেকে বহু কর্মী আসছেন পাঁচ-সাত জনের এক-একটি ব্যাচ্ করে। সংগোপনে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়, সংগোপনে তাঁরা স্বস্থানে ফিরে যান। এঁরা সবাই ধনুকে টঙ্কার দিয়েছেন, হুকুম পেলেই শর-নিক্ষেপ করবেন শত্রুর লক্ষ্যে।

সফর সমাপ্ত করে ফিরে এলাম কলকাতা। সর্বপ্রথম চলে গেলাম যতীশদার কাছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমস্ত ঘটনা এবং আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম।

যতীশদা স্থির করলেন যে ট্রেজারি-লুটের প্ল্যান বর্জন করে বার্জ-নিধনের চেষ্টায়ই সকল শক্তি নিয়োগ করতে হবে। প্রভাংশু পালকে পাঠান হল খড়গপুর, ব্রজকে খবর দিয়ে কলকাতা আনানর উদ্দেশে। ব্রজ এলে তাঁকে যতীশদা তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন।

এদিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় আমরা বিশেষ ভাবে আবেগ বিচলিত হ'লাম। বাঙলাদেশের অবিস্মরণীয় শহীদ সত্যেন বসুর ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর স্বদেশপ্রেম ও দেশসেবার ইতিহাস মেদিনীপুরবাসীর অজানা নয়। তিনি নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর পলিটিক্যাল্ সেক্রেটারি। বয়স তৎকালে যথেষ্ট হয়েছে, তার উপর রুগ্ন দেহ।

এই নির্যাতিত দেশসেবী ও নির্যাতিত তাঁদের পরিবারকে সসম্মানে আর্থিক কষ্ট থেকে মুক্তিদানের সাধু সংকল্পেই দেবেন্দ্রলাল খাঁ তাঁকে নিজের আশ্রয়ে তুলে নিয়েছিলেন।

নাড়াজোলের রাজবাড়ি স্বদেশসেবায় প্রখ্যাত। দেবেন্দ্রলালের পিতা নরেন্দ্রলাল খাঁ মেদিনীপুরের স্বদেশী-আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। পিতাপুত্রের আমলে বিপ্লবী ও দেশকর্মীরা তাঁদের সাহায্য, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা একান্ত ভাবে পেয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই বাঙলার গৌরব, মেদিনীপুরের প্রাণ ছিলেন।···

সত্যেন বসুর ভ্রাতা এই জ্ঞান বসুর প্রতি রক্তকণায় বৃদ্ধ বয়সেও বিপ্লবী-পরিবারের রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাঁর মনের যৌবন কানায়-কানায় পূর্ণ।

জ্ঞানবাবুকে কেউ বলেনি যে বার্জসাহেব বিপ্লবীদের পরবর্তী টার্গেট্। কিন্তু তিনি ধারণা করে নিয়েছেন যে তাঁর কিশোর বন্ধুরা এবার সেই প্রোগ্রামই গ্রহণ করবেন। তাই বারে বারে প্রভাংশু ও ব্রজকে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন যে, এ-যাত্রা তিনি নিজে যাবেন এ্যাক্‌শানে। এ ব্যাপারে তিনি উতলা হয়ে উঠলেন।

কী তাঁর আকুতি! তিনি বারে বারে ব্রজদের বলছেন কলকাতা থেকে 'বি-ভি'-নেতাদের অনুমতি আনাতে, তাঁকে এ্যাকশানের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে। তিনি যাবেনই আগামী এ্যাক্‌শানে। 'পরাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে'! শহীদ সত্যেনের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর অপেক্ষা করতে পারেন না। কত ছোট-ছোট ভাইয়েরা আত্মদান করে গেলেন—আর তিনি এখনো শহীদ সত্যেনের পথে পা বাড়াতে পারলেন না?...

প্রভাংশু এসে যতীশদাকে বললেন: "দিন না জ্ঞানদাকেও অনুমতি। অতবড ঐতিহ্যসমান্বিত-পরিবারের এক বৃদ্ধের সঙ্গে আমাদের তরুণরা একত্রে এ্যাক্‌শান করে ফাঁসি গেলে তার ইম্‌পেটাস্‌ হবে অভাবিত। মেদিনীপুর জ্বলে উঠবে, বাঙলার রক্তে আগুন ছুটবে, ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হবে—সর্বোপরি ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ খানখান হয়ে যাবে।"...

যতীশবাবু প্রস্তাবটি গভীর ভাবে শুনলেন। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি উত্তর দিলেন: "ছাখো, জ্ঞানবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা আমার অসম্ভব বেড়ে গেছে। তিনি আমাদের বিপ্লবী-মনের কাছে প্রণম্য। কিন্তু একটা কথা জেনো—সাধ থাকলেও সাধ্য আছে কিনা বুঝতে হবে। শুধু ভাবপ্রবণতায় চলতে যেও না। জ্ঞানবাবুর মন ও বুদ্ধি হয়ত তাঁকে বিট্রে করবে না—কিন্তু দেহ? ঐ রুগ্ন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি কার্যকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতায় তোমাদের সঙ্গে তাল না রাখতে পারেন, তখন তোমাদের চেয়েও তিনি হবেন বেশি ব্যথিত। তিনি নিজেকে মনে করবেন দারুণ অপরাধী। তখন এই ভাবমুগ্ধ মানুষটি আত্মহত্যা করেও বসতে পারেন। অধিকন্তু এ্যাক্‌শান্‌ ব্যর্থ হলে পার্টির কাছে, আমার নেতাদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব? সুতরাং প্রভাংশু, তুমি জ্ঞানবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিবৃত্ত কর।"...

প্রভাংশু চলে গেলেন জ্ঞানবাবুর কাছে দক্ষিণকলকাতায় কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর প্রাসাদে। নাড়াজোলের রাজপরিবার তৎকালে

কলকাতায়ই থাকতেন। জ্ঞানবাবুর-ও মেদিনীপুর যাবার হুকুম ছিল না। কলকাতার রাজপ্রাসাদেই তাঁকে থাকতে হত রাজার পলিটিক্যাল্ সেক্রেটারি রূপে।

জ্ঞানবাবু সমস্ত যুক্তি শুনে ভেঙে পড়লেন। যতীশ গুহর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু তৎকালে তা' সমীচীন ছিল না বলে প্রভাংশু তাঁকে ও-ব্যাপারেও নিরস্ত করলেন।...

"১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। এতদিনের অপেক্ষিত লগ্ন মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের কাছে উপস্থিত হল। ব্রজকিশোর প্রমুখ খবর পেয়েছেন যে ঐ দিনই বিকেলে মেদিনীপুর শহরে পুলিশ-গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলা হবে। এক পক্ষে মহম্মদিয়া ক্লাব, অপর পক্ষে টাউন্ ক্লাব। এ খেলায় ব্রিটিশ অফিসারগণও অংশ গ্রহণ করবেন।

খেলার মাঠের একদিকে জেলখানা, অপরদিকে আর্মারি। সুতরাং ঐ দুর্দিনেও ইংরেজ অফিসাররা সখের খেলার ব্যবস্থা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।" ('সবার অলক্ষ্যে', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭)

সংবাদ পাওয়া গেছে যে, মিঃ বার্জ স্বয়ং সে খেলায় যোগ দেবেন। তাঁর উৎসাহ নাকি সর্বাধিক। তিনি এখন কিছুটা ভয়মুক্ত—কারণ, অভিশপ্ত 'এপ্রিল' মাসটা পেরিয়ে গেছে। 'এপ্রিল' মাসকে ইংরেজ-নরনারী ভয় করতে শিখেছিল—কারণ, এই এপ্রিল মাসেই চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার আক্রান্ত হয়, এই এপ্রিল মাসেই মেদিনীপুরের দু'টি আই. সি. এস্ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হন। বীর ইংরেজপুঙ্গবেরা-ও মনে মনে কাপুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে অস্ত্রাদি যথাসময়ে পাঠান হয়েছিল। এ-ব্যাপারে প্রভাংশু পাল ও তিনু সেনকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে নানা দফায়। তাঁরা খড়গপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে কালু দাসগুপ্তের হাতে মালপত্র তুলে

দিতেন। ব্রজদের কাছে সেসব পাঠানোর দায়িত্ব ছিল কালু অর্থাৎ অমল দাসগুপ্তের।

বার্জকে ঐদিনই খেলার মাঠে তাক্ করতে হবে। কর্মদায়িত্ব পেলেন দু'টি তরুণকিশোর। অনাথ পাঁজা ও মৃগেন (গোরা) দত্ত তাঁদের নাম।

মৃগেন দত্ততো বহু পূর্ব থেকেই তৃতীয়-'এ্যানিভার্সারি'র জন্য মনোনীত হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে যাবার কথা ছিল ব্রজকিশোরের। কিন্তু এখানে অনাথের অনুপ্রবেশ ঘটল কি করে?

এই ঘটনার পশ্চাতে একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। ইতিহাস ছোট্ট হলেও তার মাধ্যমে অনাথ ও ব্রজের চরিত্র অদ্ভুত সৌন্দর্যে বৃহৎ ভাবমূর্তিসম্বলিত হয়ে ফুটে উঠেছে।

ঘটনাটি ব্রজকিশোরের মুখেই শোনা। যতীশদাকে ব্রজ জানাচ্ছেন: "ডগ্লাস-নিধনের পর আপনাদের নির্দেশেই আমরা মিঃ রক্স্‌বেরা (মেদিনীপুরের তৎকালীন সেশান্ জজ) ও পুলিশ সুপার মিঃ ইভান্স্‌কে টার্গেট্ করি। কিন্তু কাউকেই বাগে পাইনি। ইভান্স্‌কে একবার প্রায় পেয়ে গেলেও যে কারণেই হোক তিনি ফস্‌কে যান। ইভান্স্-এ্যাটেম্প্টে নিযুক্ত করা হয়েছিল মৃগেন দত্ত ও শান্তিগোপাল সেনকে। অতঃপর আমরা ঐ সাহেবদের ছেড়ে দিয়ে আপনাদের নির্দেশ মতই সব শক্তি নিযুক্ত করলাম বার্জ-এর দিকে।

এমন সময় অনাথ পাঁজা এসে আমাকে বললেন যে আগামী এ্যাক্শানে তাঁকেই পাঠাতে হবে। এতে যেন অন্যথা না হয়।...

আমি ও প্রভাংশু এ-নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের মধ্যে অনাথের তুলনা নেই। তাঁর মুখে কোন কালেই আমরা অবান্তর কথা শুনিনি। কিন্তু যে-কথা তিনি বলেন, তা প্রায় শেষ কথা। সে-কথার নড়চড় হতে পারে না। অমন স্থিতধি, নির্ভীক ও সুদক্ষ কর্মী আমাদের মধ্যে হয়তো আর একটিও নেই। কাজেই আমি

প্রভাংশুকে বললাম যে মৃগেন তো যাবেই ; আমি ভেবেছিলাম শান্তিগোপালের বদলে আমি যাব এ-যাত্রা—কারণ শান্তি নিজে একজন সবার জানিত খোলোয়াড়, খেলার মাঠে কোন এ্যাক্‌শানে তাঁকে পাঠান চলে না। অনাথের কথা শুনে আমি স্থির করেছি যে I shall sacrifice my chance—অনাথকেই এ-সম্মান দিতে হবে।...প্রভাংশুর-ও তাই মত।...এবার আপনি স্থির করুন, যতীশদা —কাকে সিলেক্ট করবেন।"...

যতীশদা বললেনঃ মেদিনীপুর-সংস্থার গোপন কার্যকলাপের সর্বদায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত, ব্রজকিশোর। তুমি আমাদের অশেষ আস্থাভাজন—আজ তুমি অনাথের ইচ্ছাকে মান দেবার জন্য নিজে সরে দাঁড়িয়েছ। তোমাদের এই প্রাণ-দেবার জন্য কাড়াকাড়ির উৎসবে সংযত 'সংগঠকে'র ভূমিকায় তুমি যে-ইতিহাস এইভাবে রেখে গেলে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি তো জানি তুমি ও অনাথ একই ইস্পাতে গড়া দুইটি শাণিত তরবারি। তুমি তৎসঙ্গে নির্মম অথচ সুন্দর এক সংগঠক। তোমার সিলেক্‌শান আমি মঞ্জুর করলাম।"...

ব্রজ জানিয়ে দিলেন অনাথ পাঁজাকে যে তিনি ও মৃগেন যাবেন বার্জ-হত্যার অভিযানে।

অনাথ নির্বিকার। তাঁর ভাবাবেগ কেউ বুঝলো না। বিনয় বসুর সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় অনাথের চরিত্রে। এসব কাজ যেন তাঁর নিত্যদিনের করণীয় কাজেরই অন্তর্গত।

বিনয় বসুর মতই নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, নিস্তরঙ্গ তাঁর চরিত্র। উভয়েই সমুদ্রগভীরের প্রশান্তি ধারণ করে ইতিহাস সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে যেন জন্মেছিলেন এই ভূমণ্ডলে।

• তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। খেলা সুরু হয়ে যাচ্ছে। বার্জ মোটর থেকে নামলেন। মাঠে ঢুকতেই হাত পাঁচেক দূর থেকে অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত পর পর গুলি করলেন। দুর্ধর্ষ ম্যাজিস্ট্রেট ধরায় গড়িয়ে পড়লেন।…সশস্ত্র গার্ডের গুলিতে অনাথ-মৃগেনও প্রাণ দিলেন।…

বি-ভি-র দুইটি সিংহ-শাবক আপন রক্তে মেদিনীপুরে "তৃতীয় বার্ষিকী" পালন করে গেলেন। সারা ভারতবর্ষ মাথা নোয়াল শৌর্যময় মেদিনীপুরের উদ্দেশে। সারা ব্রিটেন আতঙ্কে তাকিয়ে রইল বাঙলার পানে।…

এর পর স্বভাবতই পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সেদিনই মেদিনীপুরে দলে দলে তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। ঘটা করে 'বার্জ-হত্যা মামলা' শুরু হল মাস তিনেকের মধ্যে। সবাইকে শেষ পর্যন্ত মামলায় জড়ান গেল না। নজরবন্দী করে রাখা হল অনেককে।

কিন্তু মামলায় যাঁদের জড়ান গেল, তাঁদেরই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের এবং পরে হাইকোর্টের বিচারে নানাবিধ দণ্ড দেওয়া হল। তন্মধ্যে ফাঁসি গেলেন ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষ।* তা' ছাড়া কামাখ্যা ঘোষ (ছোট), সনাতন রায়, সুকুমার সেন ও নন্দদুলাল সিংহের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা।

কিছুদিনের মধ্যে মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে আসা শান্তি-গোপালকে কলকাতার বাসে মেদিনীপুরর এক আই-বি ওয়াচার-ই সনাক্ত করে ধরে ফেলে। শান্তি সেন গ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর আনীত হন। সরকারপক্ষ দ্বিতীয়বার একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসালেন। বিচারে শান্তিরও যাবজ্জীন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ হল।…

আমরা কলকাতায় সশঙ্কিত অবস্থায় আছি। শুধুমাত্র প্রভাংশুকে তাঁর ৪২/১ নং বলরাম দে স্ট্রিটের (উত্তর কলিকাতা) বাসা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ১৪ই তারিখে, অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর থেকে দু' সপ্তাহের

মধ্যে। এ ছাড়া পুলিশ আর কিছু বাড়াবাড়ি তখনো করে নি কলকাতা শহরে।

আমাদের 'বেণু'-কাগজ ইতিমধ্যে পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে, প্রেস ও 'সিল্ড্' হয়ে আছে পুলিশের হুকুমে।

সুতরাং আমি কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। ফিরে এলাম অক্টোবরের শেষের দিকে।

হঠাৎ দেখলাম পুলিশ যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। ৩০শে অক্টোবর আমাদের কলকাতার বন্ধুবান্ধব অনেকেই ধরা পড়লেন। আমিও সেদিন গ্রেপ্তার হলাম। কিন্তু যতীশদাকে পুলিশ ধরল্ না। সুতরাং আমাদের সংগঠন টিকে থাকল। টিকে থাকল বলেই ১৯৩৪ সালের ৮ই মে যতীশদার নেতৃত্বে এবং সুকুমার (লাণ্টু) ঘোষ্ প্রমুখের সহযোগিতায় বাঙলার দুর্জয় গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন্‌কে দার্জিলিংএর ঘোড়দৌড়ের মাঠে আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছিল, সম্ভব হয়েছিল * জাঁদরেল শাসকের লালাটে পলিটিক্যাল্ ডেথের লিখন এঁকে দেওয়া।

বার্জ-হত্যা তথা ব্রিটিশ-শাসককে প্রাণদণ্ড দানের কাহিনী ইতিহাসবিশ্রুত হয়ে গেছে। আমি শুধু লিখে গেলাম সেইটুকু কথা, যা আমাদের দু'চার জনেরই জানা ছিল—অপরের নয়।

শ্রীনিরঞ্জীব রায়

স্টেশান রোড্,
জলপাইগুড়ি
॥ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ ॥

---

* ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণের ফাঁসির তারিখ ২৫, ১০, ৩৩ সন। নির্ম্মলজীবনের ফাঁসি— ২৬, ১০, ৩৪ সন।